প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, 1949

প্রকাশক শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
92 আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
5 চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

প্রারম্ভ

ব্রহ্মাণ্ড

শিশু আকাশের চাঁদ ধরতে যায়, মনে করে চাঁদ তার হাতের কাছেই রয়েছে।

শিশু একটু বড় হল। এখন অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সে মনে করে যেন একখানা চাঁদোয়া থেকে অনেকগুলো দীপ মিট্‌মিট করে আলো দিচ্ছে। ওই দীপগুলো কি, কত দূরে ওরা আছে, দিনের বেলায় ওরা কোথায় থাকে, তখন ওদের দেখা যায় না কেন,—এই সব কথা তার মনে আসতে লাগল।

আর একটু বড় হয়ে সে লক্ষ্য করল, ওই সব দীপ এক জায়গায় স্থির নেই, ধীরে ধীরে আকাশের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে দেখল সূর্যও সকালে পুব দিকে উঠে সমস্ত দিন আকাশের উপর দিয়ে চলে সন্ধ্যেবেলায় পশ্চিমে অস্ত যায়।

সে আরও বড় হতে থাকল। এখন একে একে সে অনেক কথা জানতে লাগল।

*　　*　　*　　*

ছোট ছেলে যেমন মনে করছে যে পৃথিবী স্থির

আছে, সূর্য আর আকাশের ওই দীপগুলি তার চারদিকে ঘুরছে, আগের দিনের মানুষও সেই রকম ভাবত। তারপর কেউ কেউ অন্য রকমের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বললেন, আকাশে সূর্য স্থির আছে, ওই দীপগুলোও স্থির আছে, ঘুরছে আমাদের পৃথিবী, একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, সেই রকম। তাঁরা বললেন, পৃথিবীর এই রকম ঘোরার জন্যে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হচ্ছে। আমাদের দেশে আর্যভট্ট প্রথম এই কথা বলেছিলেন, তারপর অন্য দেশের কোপারনিকস ও অপর দুএকজন লোকও এই রকম বললেন। এঁদের কথা কেউ কেউ মেনে নিল, অনেকে নিল না।

তিনশ বছরেরও কিছু আগেকার কথা, গ্যালিলিও এক দুরবীন তৈরি করলেন। এ এক আশ্চর্য যন্ত্র! এ দিয়ে দেখলে খুব দূরের জিনিস একেবারে কাছের গোড়ায় দেখায়, বড় দেখায়, অনেক জিনিস যা খালি চোখে দেখা যায় না, এ দিয়ে তা ধরা পড়ে। এই দুরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে আকাশে অনেক নতুন নতুন জিনিস লক্ষ্য করা হল, নতুন নতুন কথা জানা যেতে লাগল, এখন আর কোন সন্দেহই রইল না যে পৃথিবী একটা লাট্টুর মতোই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে, আর সূর্য স্থির। কিন্তু সে সময় একথা বলার জন্যে গ্যালিলিওকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। জানা গেল যে পৃথিবী শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে না, পাক খেতে খেতে সে সূর্যের চারদিকেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পাক খেতে তার লাগে এক দিন, আর সূর্যের চারদিকে তার ঘুরে আসতে লাগে প্রায় 365 দিন। এইটে হল আমাদের বছর। কি করে জানা গেল? উপায়টি খুব সোজা। আজ আকাশে যখন একটা নক্ষত্র উঠল, তখন যদি সময়টা দেখে রাখি, কাল দেখব সেটা 4 মিনিট আগে উঠেছে, আর তারপর দিন আরও 4 মিনিট আগে। এমনি করে যখন দেখব সেই নক্ষত্রটি আবার প্রথম দিনকার সময়ই আকাশে উঠল, তখন 365 দিন কেটে গেছে। কাজেই জানা গেল বছরে 365 দিন। কিন্তু কি মজাটাই চলেছে, 365 দিনে আমরা কত কোটি মাইল ঘুরে আসছি, টিকিট কিনতে হয় না, পয়সা লাগে না। তবে একটু মুস্কিলও আছে,—থামতে বললে থামবে না, চিরদিন একইভাবে ঘুরতে থাকবে। অবশ্য থামলে বিপদ ঘটত, আমরা কোথায় যে ছিট্‌কে যেতুম, তার ঠিক নেই।

সূর্যের চারদিকে শুধু আমাদের এই পৃথিবী নয়, আকাশের আরও কয়েকটি দীপ ঘুরছে। তাদের দীপ বলা হল বটে, কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্য থেকে তারা যে আলো পায় তারই খানিকটা তারা ছড়ায়, এরই কিছু পৃথিবীর দিকে আসে, তাই আমরা ওগুলিকে

উজ্জ্বল দেখি। এদের বলা হয় গ্রহ। এই কয়টি গ্রহ ও চাঁদ ছাড়া আকাশে যে অগুন্তি দীপ মিট্‌মিট করছে, তাদের বলা হয় নক্ষত্র। সূর্যের মতো এরা নিজেরাই আলো দেয়। খালি চোখে গ্রহ ও নক্ষত্রের তফাৎ বেশ বোঝা যায়। নক্ষত্ররা মিট্‌মিট করে, গ্রহের আলো স্থির।

কোন কোন নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল, কেউ কিছু কম। কিন্তু তা যদি হয়, তবে তাদের কাছ থেকে যে আলো আসছে, তা অত ক্ষীণ কেন? তার একমাত্র কারণ হল এই, ওই নক্ষত্ররা পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে রয়েছে। এই দূরত্বের কথা ভাবতে গেলে আমাদের মাথা গুলিয়ে যায়।

আমার হাতের পেন্সিলটা চার ইঞ্চি লম্বা। ঘরটা লম্বায় কত? এখন আর আমরা ইঞ্চিতে বলি না, বলি লম্বায় এত ফুট, কারণ ইঞ্চিতে সংখ্যাটা অনেক বড় হয়ে যায়। আবার, কলকাতা থেকে বর্ধমান কত দূর, একথা বলতে হলে ফুটও চলে না, হিসেবটা মাইলে দিতে হয়। কিন্তু মাইলেরও সংখ্যা যদি বহু বহু কোটি হয়, তবে মাইলও চলে না। এই রকমের দূরত্ব আর এক রকম করে প্রকাশ করা হয়।

আলোর বেগ হল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অর্থাৎ একটি মাত্র সেকেণ্ড পার হতে যে সময় লাগে সেই সময়টুকুর মধ্যে আলো গিয়ে পৌঁছবে এক লক্ষ

ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে। কিন্তু যা মাত্র এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল চলে, মানুষ তার বেগ মাপল কি করে? কিন্তু মেপেছে, অনেক বার মেপেছে, অনেক রকম করে মেপেছে, আর ওই একই ফল পেয়েছে। এই সবই তো হল বিজ্ঞানের কেরামতি। কিন্তু সে কথা যাক, আমরা হিসেবের কথা বলছিলুম। খুব বেশি দূরের কথা আমরা সময়ের হিসেবে বলব। যদি বলি একটা জিনিস এক আলো-সেকেণ্ড দূরে রয়েছে, তবে আমরা মনে মনে বুঝব ওই জিনিসটা আমাদের কাছ থেকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে আছে। বলাটা সহজ হবে।

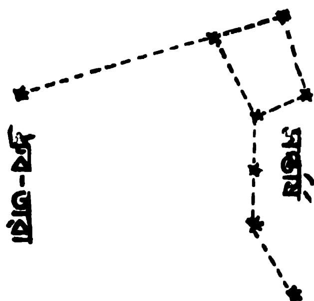
আকাশের দীপগুলির মধ্যে চন্দ্র আমাদের সব চেয়ে নিকট প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে মাত্র দু লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে চন্দ্র রয়েছে। কিন্তু 'মাত্র' কথাটা কেমন হল! 'মাত্র' বইকি! অন্য দীপগুলি এত দূরে রয়েছে, তাতে পৃথিবী ও চাঁদ তো এপাড়া ওপাড়ায় বাস করে! এখন আলোর সঙ্গে দৌড়তে পারলে চন্দ্রে পৌঁছতে দেড় সেকেণ্ডও লাগবে না। তাই চন্দ্র কত দূরে রয়েছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে আমরা বলব, চন্দ্র পৃথিবী থেকে দেড় আলো-সেকেণ্ড দূরে রয়েছে। তেমনি সূর্যের দূরত্ব হল আট আলো-মিনিট। মাইলের হিসেবে ওটা দাঁড়াবে এইরকম,—৪ আলো-মিনিট হল 8×60 আলো-সেকেণ্ড, সুতরাং $8 \times 60 \times 186000$ মাইল।

পৃথিবীর সব কাছে যে নক্ষত্রটি রয়েছে, এই মাপ-কাঠিতে তার দূরত্ব হল সাড়ে চার আলো-বছর। সাড়ে চার আলো-বছর কথাটার মানে কি হল একবার ভেবে দেখা যাক। সাড়ে-চারকে 365 দিয়ে গুণ করলে হবে দিন, তাকে 24 দিয়ে গুণ করলে হবে ঘণ্টা, তার 60 গুণ হবে মিনিট, সেই মিনিটের 60 গুণ হল সেকেণ্ড, সেই গুণফলকে 186000 দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়াবে, তত মাইল হবে পৃথিবীর সব-কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব। সাড়ে চার বছর আগে যে আলো ওই নক্ষত্র থেকে বেরিয়েছিল, আজ তা আমার চোখে এসে পড়ল, আমি নক্ষত্রটিকে দেখলুম। আর একটা কথা ভাববার আছে। আজ দেখলুম বলে বলতে পারলুম না যে ওই নক্ষত্রটি আজ ওখানে রয়েছে। এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে সাড়ে চার বছর আগে ওই নক্ষত্র ওখানে ছিল। কিন্তু এটাকে সব-কাছের নক্ষত্র বলা ভুল হল। সব-কাছের নক্ষত্র হল সূর্য। সূর্য একটা নক্ষত্র।

উত্তর দিকে একই জায়গায় ওই যে ধ্রুবনক্ষত্র দেখা যাচ্ছে, সে আছে আমাদের কাছ থেকে প্রায় 47 আলো-বছর দূরে। এই ধ্রুবনক্ষত্রকে আমাদের ভাল রকম চিনে রাখা দরকার, কারণ ওই নক্ষত্র যে দিকে রয়েছে, সেটা হল ঠিক উত্তর। আকাশে অন্য নক্ষত্ররা চলে যাচ্ছে, কিন্তু এই ধ্রুব-নক্ষত্র এক জায়গায় স্থির আছে, সমস্ত রাতই আছে, বার-মাসই আছে। রাতের অন্ধকারে দিশেহারা হলে এই

ধ্রুবনক্ষত্র দেখে আমরা দিক ঠিক করতে পারি। ধ্রুবনক্ষত্রের কাছাকাছি সাতটি নক্ষত্র আছে, তাদের বলা হয় সপ্তর্ষি। এরা বেশ জ্বল্‌জ্বলে, এদের তুলনায় ধ্রুবনক্ষত্র একটু ম্লান। এই সপ্তর্ষির এক দিকে যে দুটো নক্ষত্র রয়েছে, তাদের মধ্যকার সরল রেখাটা বাড়িয়ে দিলে সেই রেখা ধ্রুবনক্ষত্রের উপর দিয়ে যাবে। অনেক সময় এই ভাবে ধ্রুবনক্ষত্রকে চেনা যায়।

এখন এই ধ্রুবনক্ষত্র, যা 47 আলো-বছর দূরে রয়েছে, সে কি সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র? মোটেই না! এ-রকম



চিত্র—1

সপ্তর্ষি ও ধ্রুবতারা

অনেক নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব হাজার, লক্ষ, কোটি আলো-বছর! মাইলের হিসেবে আর কাজ নেই, ভাবলে মাথা বন্‌বন্‌ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে এ-সব হিসেব করেছে।

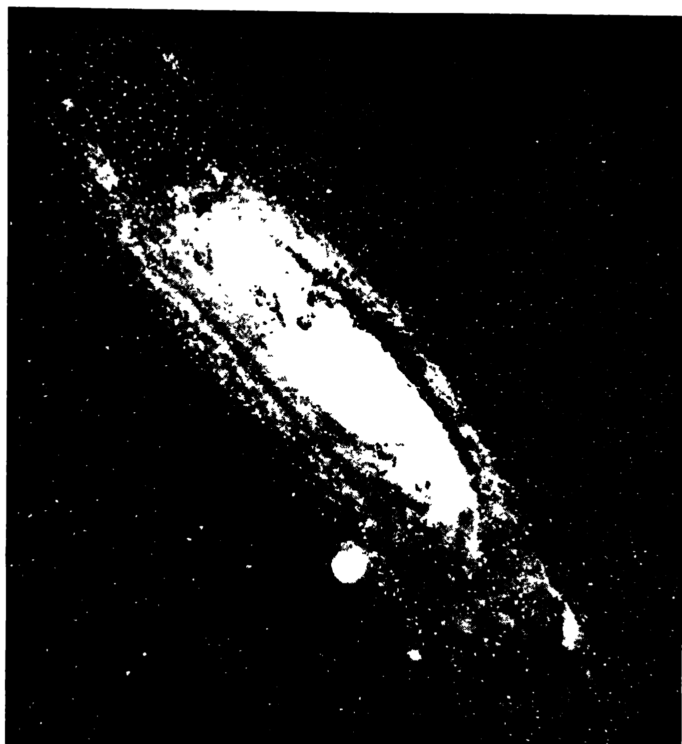
পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার

থেকে ওধার অবধি আলোর একটা ধারা যেন চলে গিয়েছে। একে বলা হয় ছায়াপথ। দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অসংখ্য নক্ষত্র মিলে এই ছায়াপথ হয়েছে।

আবার দেখা যায় আকাশের খানিক খানিক জায়গা যেন আলোতে লেপে গিয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা (চিত্র ২)। এক একটা নীহারিকায় বহু কোটি নক্ষত্র জড় হয়ে রয়েছে। আমাদের সূর্য এইরকমের একটা নীহারিকার মধ্যে আছে। কিন্তু সে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, ছুটেছে, প্রচণ্ড বেগে ছুটেছে। এই পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, পৃথিবীর চাঁদ, যে সব গ্রহের চাঁদ আছে সেই সমস্ত চাঁদ—তার পরিবারগোষ্ঠীর এই সকলকে নিয়ে সূর্য প্রচণ্ড বেগে চলে একটা মস্ত চক্কর দিচ্ছে। সেকেণ্ডে 12 মাইল বেগে ছুটছে, আর একটা চক্কর দিতে লাগছে বহু কোটি বছর।

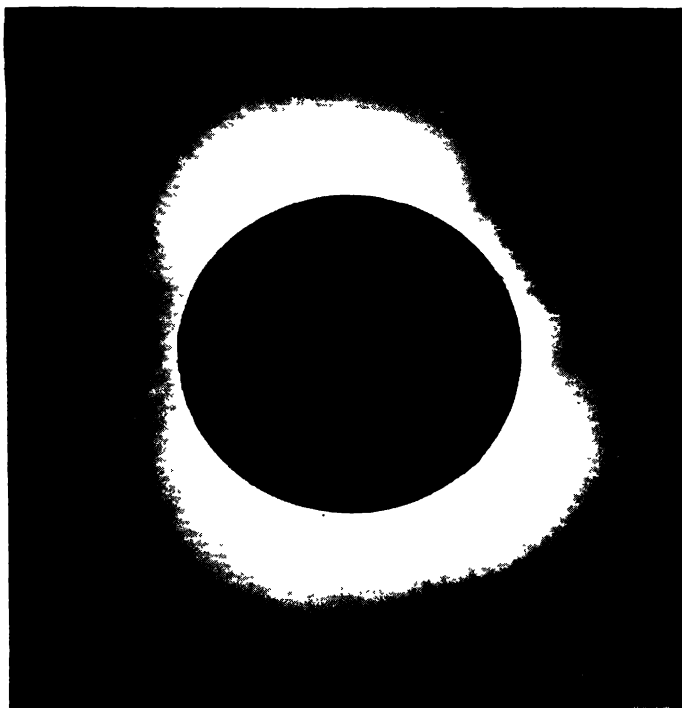
ব্রহ্মাণ্ডে কত যে নীহারিকা রয়েছে! সব চেয়ে দূরে যে নীহারিকা রয়েছে, তার থেকে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় 50 কোটি বছর। আবার সমগ্র নীহারিকার সংখ্যা তিন কোটিরও কম নয়। এই সব নক্ষত্রের দল নিয়ে যে ব্রহ্মাণ্ড, কেউ কেউ বলছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডটা ফুলে উঠছে। পৃথিবী তৈরি হবার সময় ব্রহ্মাণ্ড যত বড় ছিল, এখন নাকি তার দুগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

আগের যে-সব কথা বলা হল আজকালকার সবচেয়ে



চিত্র—১

নীহারিকা



চিত্র—3

সূর্যের চারিপাশ

বড় দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করে মানুষ ওই সব খবর পেয়েছে। আমাদের এখনকার জানা খবর হচ্ছে ওই। সম্প্রতি আমেরিকায় আরও বড় একটা দূরবীন তৈরির কাজ শেষ হল। এ দিয়ে যখন দেখা যাবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের আরও কত খবর মানুষ পাবে।

কি প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড! তার মধ্যে কতটুকু এই পৃথিবী! বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় আড়াইশ কোটি, আর কত যুগ ধরে মানুষ এখানে বাস করে আসছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে কত ক্ষুদ্র একটি মানুষ! কিন্তু মানুষের একটা বড় গর্ব হল এই যে, বুদ্ধি দিয়ে সে ওই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে জানছে, তার অনেক খবর টেনে বের করছে।

সূর্য ও চন্দ্র

সূর্য

ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি নক্ষত্র, তাও সব চেয়ে বড় নক্ষত্র নয়, মাঝারি গোছের একটা নক্ষত্র। কিন্তু আমাদের পৃথিবী, অন্য গ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, এদের সব চালাচ্ছে ওই সূর্য।

সূর্য কি শুধু আলো দিয়ে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করছে, আর তাপ দিয়ে শীতে আমাদের গরম রেখেছে? তা নয়! আমাদের খাদ্য আমাদের দেহের শক্তি ওই সূর্যের

তেজ থেকেই আমরা পাচ্ছি। এক কথায় বলতে গেলে, সূর্য জীবের জীবন। তাই তো প্রাচীন কাল থেকে অনেক দেশের লোক সূর্যকে পূজো করে এসেছে।

সূর্য সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জেনে ফেলেছি। জেনেছি,—

সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে,

ওর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের 108 গুণ,

আয়তনে ও পৃথিবীর চেয়ে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ বড়,

ওজনে পৃথিবীর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ ভারি,

লাট্টুর মতো পৃথিবী যেমন পাক খাচ্ছে, সূর্যও তেমনি পাক খাচ্ছে, এক পাক ঘুরতে তার লাগছে ছাব্বিশ দিন,

সমপরিমাণ জলের ও প্রায় দেড়গুণ ভারি।

আমাদের পৃথিবীর উপর মাটি, পাথর প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু সূর্যে সে রকম কিছু নেই, সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। কোন্ কোন্ গ্যাস সূর্যে জ্বলছে? প্রমাণ পাওয়া গেছে, সূর্যে এমন কোন গ্যাস নেই যা পৃথিবীতে মেলে না। এখন দেখা যাক, সূর্যের উত্তাপ কি ধরণের। যে উষ্ণতায় জল ফোটে, সেটা ধরা হয় একশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূর্যের উষ্ণতা হল বাইরের দিকে ছ হাজার ডিগ্রী, আর মাঝখানে

প্রায় চার কোটি ডিগ্রী। কি প্রচণ্ড এই উষ্ণতা! আমরা ভাবতেও পারিনে।

সূর্যে যে কালো কালো দাগ দেখা যায়, সে সব হচ্ছে সেখানকার অগ্নিকাণ্ডের প্রচণ্ড তোলপাড়। সূর্যের গা থেকে অনেক দূর অবধি জ্বলন্ত বাষ্প চলে গিয়েছে, পূর্ণ-সূর্যগ্রহণের সময় সেগুলি দেখা যায়। (চিত্র 3)

সূর্য তার চারদিকে সমস্ত ক্ষণ তাপ ছড়াচ্ছে। যে পরিমাণ ছড়াচ্ছে, তার অতি অল্প অংশ আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। একটা সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক সূর্য খরচ করছে দুশ কুড়ি কোটি টাকা। পৃথিবীর ভাগে আসছে মাত্র এক টাকা। তবু সমস্ত পৃথিবীর উপর সূর্যের যে তাপ পড়ছে তা যদি এক জায়গায় এসে জমত, তাহলে তা দিয়ে দশ লক্ষ মণ জলকে এক মিনিটে টগ্‌বগ করে ফুটিয়ে তোলা যেত। আর আলোর হিসেবটা হল এই,—পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র যে-পরিমাণ আলো দেয়, সূর্যের আলো তার প্রায় ছ লক্ষ গুণ জোরাল। সূর্য থেকে আলো আসে শুধু তার উপরের তল থেকে।

একটা কথা আমাদের মনে জাগে। কত দিন ধরে সূর্য তার ওই তাপ দিয়ে চলেছে? অত তাপ সে পাচ্ছে কোথা থেকে? আর যার খরচ এত, তার দেউলে হতে আর কদিন? সূর্য কি তবে শিগ্‌গির নিবে যাবে? এ-সব কথা এখন থাক। তবে আমাদের ভয় দূর করবার জন্যে

জেনে রাখা ভাল যে, বহু কোটি বছর ধরে সূর্য তাপ ও আলো দিয়ে আসছে ও আরও বহু কোটি বছর দিতে থাকবে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসার করতে পারি।

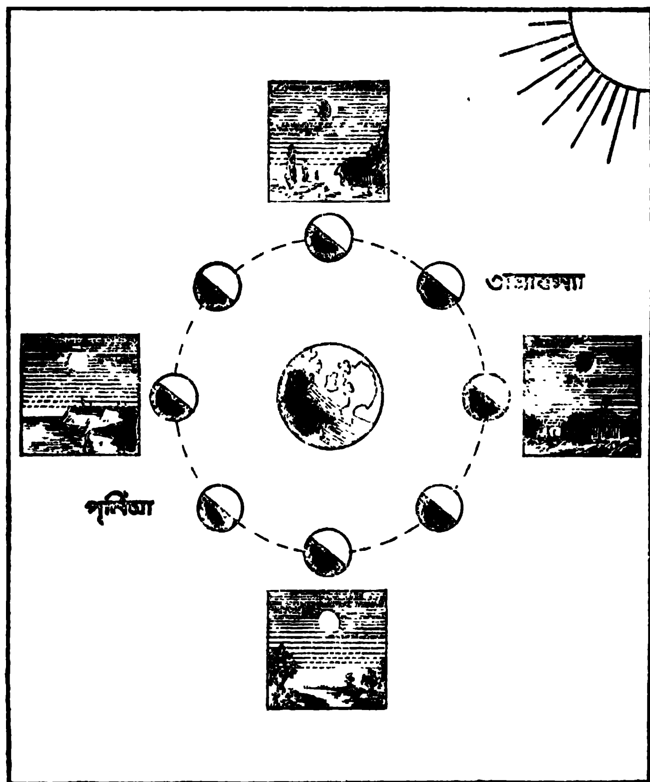
চন্দ্র

এখন চন্দ্রের কথা ধরা যাক। চন্দ্র নক্ষত্র না গ্রহ? নক্ষত্র তো নয়ই, ঠিক গ্রহ বলেও ধরা যায় না। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, আর চন্দ্রকে নিয়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। চন্দ্রকে একটা উপগ্রহ বলা যেতে পারে।

চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের যে আলো চন্দ্রের গায়ে পড়ে সেখানে তা ছড়ায়, আর তার খানিক পৃথিবীতে এসে পড়ে। এই হল জ্যোৎস্না। তা যেন হল, কিন্তু প্রতিমাসে একটি করে রাত আসে, যে-রাতে নির্মল আকাশে কোন সময়ের জন্যও চাঁদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর দুএক দিন পরে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকের আকাশে নিচের দিকে অল্প সময়ের জন্য এ দেখা দেয়, তখন এর চেহারা একটা সরু কাস্তের মতো। তারপর দিনের পর দিন ও বাড়তে থাকে, শেষে আমরা পূর্ণ-চন্দ্র দেখি, পুব দিকের আকাশে সন্ধ্যার সময় সেদিন ওর উদয়, আর সমস্ত রাত জ্যোৎস্না ঢেলে ভোরের বেলায় পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়।

সূর্য তো এক রকমই আছে, চাঁদের চেহারার ওরকম

বদল হয় কেন ? কারণটা হল এই। সূর্যের নিজস্ব আলো আছে, সে সেই আলো নিয়ত চারদিকে ছড়াচ্ছে। চাঁদের



চিত্র—4
চন্দ্রকলা

নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের কাছ থেকে যে আলো সে পায় তার কিছু ছড়ায়। এখন সূর্যের চারদিকে

চন্দ্র ঘুরছে, তার ফলে চন্দ্রের যে অংশের উপর আলো পড়ছে, তার সবটা সব রাতে পৃথিবী থেকে দেখা যাচ্ছে না। যে-রাতে সমস্তটা দেখা যাবে সে রাত হবে পূর্ণিমা, আর যে-রাতে একটুও দেখা যাবে না সেটা হল অমাবস্যা। অমাবস্যার পর যখন শুক্লপক্ষ আরম্ভ হল, তখন রাতে চাঁদের স্থিতি মোটামুটি 2 দণ্ড অর্থাৎ 48 মিনিট করে বেড়ে যেতে লাগল।

প্রায় 29½ দিনে চন্দ্রকে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে দেখা যায়। এটা হল চান্দ্র মাস। এই রকম বারটা মাসে হল চন্দ্রের একটা বছর, হিসেবে প্রায় 354 দিন দাঁড়ায়। এদিকে 365 দিনে হল সূর্যের বছর, এ দুয়ের তফাৎ প্রায় 11-12 দিন। তাই দেখা যায়, আজ যে তারিখে বৈশাখী পূর্ণিমা হল, আসছে বছর তার 11-12 দিন আগে ওই তিথি আসবে। হিন্দুমুসলমানের অধিকাংশ পূজা-পার্বণ তিথি-অনুসারেই হয়, তাই আমরা দেখি ওই সব পার্বণ প্রতিবছর 11 কি 12 দিন করে এগিয়ে আসে। এবার দুর্গাপূজা যদি 28 আশ্বিন হয়, তবে মোটামুটি বলা যায়, আসছে বছর দুর্গাপূজা হবে 16 আশ্বিন। মুসলমানদের পার্বণও এই রকম পিছু হটে আসে, আর সমস্ত বছর ধরে ঘোরে। হিন্দু জ্যোতিষ কিন্তু এক মাসের বেশি এগিয়ে আসতে দেয় না, কারণ হিন্দুর পূজাপার্বণ ঋতুর সঙ্গে জড়িত। ওই রকম না করলে শারদীয়া পূজা পড়ে যেত দারুণ গ্রীষ্মে,

বাসন্তী পূর্ণিমা আসত শরৎ' কালে। যেই এক মাসের বেশি এগিয়ে আসবার উপক্রম হয়, অমনি যে মাসে দুটো অমাবস্যা পড়ে, সেই মাসে পূজাপার্বণ বন্ধ রেখে সেই মাসকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে পূজাপার্বণের তারিখ এক মাস ঠেলে দেয়। যে মাসকে বাদ দেওয়া হয়, সে মাসটাকে বলা হয় মলমাস।

খালি চোখে আমরা চাঁদে কালো কালো দাগ দেখি, বলি চাঁদের কলঙ্ক। বড় দুরবীন দিয়ে দেখে ওই সব দাগের তাৎপর্য বোঝা গেছে। কল্পনায় ধরা যাক, আমরা কোন রকমে চাঁদে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে গিয়ে কি দেখব ? দেখব, চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই ; সুতরাং মানুষ-জন্তু-জানোয়ার-গাছপালার কোন চিহ্ন নেই। যে কালো কালো দাগ পৃথিবী থেকে দেখছিলুম সেগুলি আর কিছু নয়, বড় বড় পর্বত, আর অসংখ্য আগ্নেয়গিরি—এখন নিবে গেছে (চিত্র 5)। দেখলুম চাঁদের আয়তন ছোট, এর ব্যাস মাত্র দুহাজার মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের সিকি। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। পৃথিবী একটা জিনিসকে যে জোরে টানে এখানে সে জোর কমে গিয়েছে, মাত্র ছ-ভাগের এক ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে শরীর বেশ হাল্কা ঠেকছে, সিঁড়ি উঠতে কষ্ট হয় না, একটু একটু লাফ দিয়ে উঁচু উঁচু পাঁচিল টপকাচ্ছি, একতলা-দোতলার ছাতে উঠে পড়ছি। যুদ্ধে যে সব কামান ব্যবহার করা

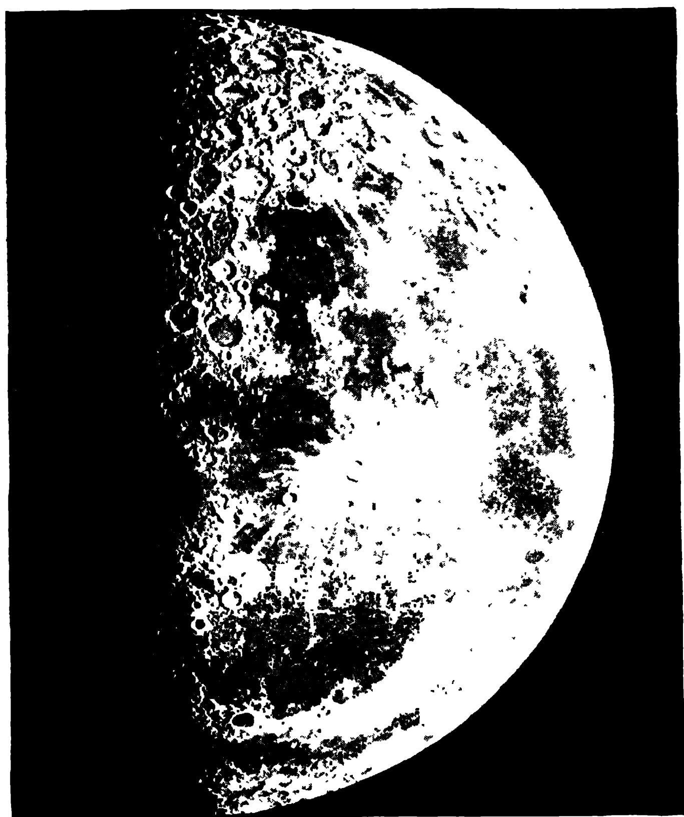
হয়, এখানে সেই রকম কামান থেকে গোলা ছাড়লে তা আর চন্দ্রে ফিরবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ-সব আমাদের কল্পনা। তবে কল্পনায় যা দেখলুম, বড় দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করে, আর হিসেব থেকে মানুষ সে-সব খবর পেয়েছে। চাঁদের একটা দিকই চিরদিন পৃথিবীর দিকে আছে। চাঁদে যেতে পারলে তার ওদিকটায় কি আছে একবার দেখে আসা যেত।

কল্পনা যখন করা হল তখন তা আর একটু বাড়ান যাক, সূর্যে গিয়ে পৌঁছলুম। পৃথিবীতে আমার ওজন ধরা যাক দু মণ। সূর্যে আমার ওজন দাঁড়াবে 56 মণ, এখানকার ওজনের 28 গুণ বেশি।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

অনেক আগের কালেও মানুষ আকাশে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ লক্ষ্য করেছে। মধ্যাহ্নকাল, আকাশে একটুও মেঘ নেই, আস্তে আস্তে সূর্যের ক্ষয় হতে থাকল। পাখি বাসায় ফিরে এল, ঘোড়া পথের উপর শুয়ে পড়ল, গোরুরা দলবদ্ধ হয়ে শিং উঁচু করে দাঁড়াল, মানুষ ভয় পেল, কি একটা অমঙ্গল বুঝি ঘটে।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটা ভারি মজার গল্প আছে। কলম্বস আমেরিকায় পৌঁছেছেন, সেখানকার লোকেরা কলম্বস ও তাঁর সঙ্গীদের চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেছে,



চিত্র—২

চন্দ্রে পাহাড়-পর্বত



চিত্র—7

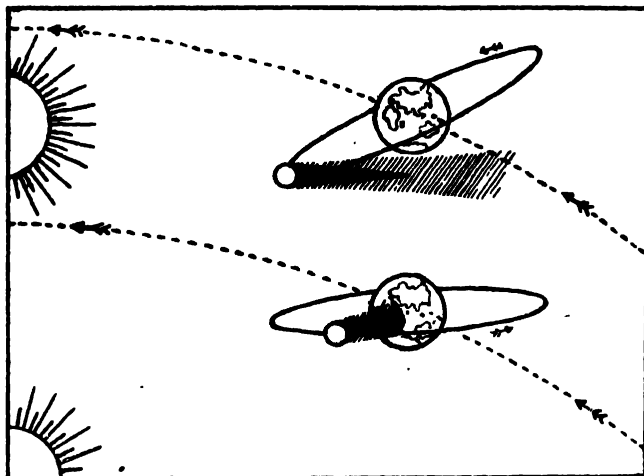
হ্যালির ধূমকেতু

ভয়ও পেয়েছে। কেউ কারও কথা বোঝে না। এদিকে কলম্বসের খাবার ফুরিয়ে এল, কলম্বস ইসারায় তাদের কাছে খাবার চাইলেন, তারা দিল না। কলম্বস অস্থির হয়ে পড়লেন, শেষ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এল। কলম্বসের জানা ছিল যে সেদিন সূর্যগ্রহণ হবে। তিনি লোকদের ডেকে বুঝিয়ে দিলেন যে যদি তারা তখনই খাবার এনে না দেয়, তবে তিনি সূর্যকে নিবিয়ে দেবেন। লোকে কলম্বসের কথা বিশ্বাস করল না, চলে গেল। কিছু পরেই সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হল। লোকেরা ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে কলম্বসের কাছে ছুটে এল, ভারে ভারে খাবার আনতে লাগল। কলম্বস বললেন,—আচ্ছা, আমি খুশি হয়েছি, সূর্যকে বলছি দেখা দিতে। এদিকে গ্রহণের সময় শেষ হল, সূর্য দেখা দিল, লোকে কলম্বসের জয়ধ্বনি করতে থাকল।

গ্রহণের কারণ যতদিন মানুষ জানেনি, ততদিন এ সম্বন্ধে অনেক গল্প চলে এসেছে। শেষ অবধি জানা গেল যে, কি সূর্যগ্রহণ কি চন্দ্রগ্রহণ, এরা আলোছায়ার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

সামনে একটা আলো জ্বলছে দেখছি। মাঝে যদি একজন লোক এসে দাঁড়ায়, আলো আর দেখা যাবে না। চোখের খুব কাছে একখানা গোল চাকৃতি ধরে সূর্য বা চন্দ্রকে ঢেকে ফেলা যায়। গ্রহণ ঠিক এই রকমের

ব্যাপার, আর কিছু নয়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আবার পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে যেই চন্দ্র এসে পড়ল, সূর্য ঢাকা গেল, সূর্যগ্রহণ



চিত্র—6

(উপরে) চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর গায়ে পড়ল না।
অমাবস্যা, কিন্তু সূর্যগ্রহণ নয়।
(নিচে) চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ল।
অমাবস্যা, আর সূর্যগ্রহণ হল।

হল। আবার সূর্যকিরণ বাধা পেয়ে যে ছায়া ফেলল, চন্দ্র যদি সেই ছায়ার মধ্যে ঢোকে, তবে চন্দ্রগ্রহণ হবে।

এখানে একটা কথা আছে। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখনই পরপর এক সরলরেখায় থাকবে, তখনই সূর্যগ্রহণ

হবে। কিন্তু প্রতি অমাবস্যায় তারা কি এই রকম নেই? যদি থাকে, তবে প্রতি অমাবস্যায় তো সূর্যগ্রহণ হবার কথা; কিন্তু তা তো হয় না। প্রতি অমাবস্যায় সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী পরপর থাকে বটে, কিন্তু সকল অমাবস্যায় তারা এক সরলরেখায় থাকে না। যে অমাবস্যায় তারা পরপর থেকেও আবার এক সরলরেখায় থাকে, সেই অমাবস্যায়ই সূর্যগ্রহণ হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। সূর্যকে বেষ্টন করে পৃথিবী এক সমতলে ঘুরছে, আবার পৃথিবীকে বেষ্টন করে চন্দ্র আর এক সমতল ক্ষেত্রে ঘুরছে। এ দুই সমতল ক্ষেত্র কিন্তু এক নয়, একটার উপর আর একটা একটু কাত হয়ে রয়েছে। এর ফলে ওরা পরপর থাকলেও সব সময় এক সরলরেখায় থাকে না। এক সরলরেখায় যদি না থাকে, তবে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর গায়ে পড়বে না, ছায়া পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে যাবে, সূর্যগ্রহণ হবে না। তবে চন্দ্রের যে অর্ধেকটা পৃথিবীর দিকে সেখানে সূর্যের আলো পড়ল না, সুতরাং সেদিন অমাবস্যা হল, অথচ সূর্যগ্রহণ হল না। সেই রকম পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হলেও সকল পূর্ণিমায় তা হবে না।

প্রাচীন চীনদেশের বই-এ খ্রীস্টপূর্ব 2154 সালের সূর্যগ্রহণের কথা লেখা আছে। হিসেবে দেখা গিয়েছে, একশ বছরের মধ্যে সূর্যের পূর্ণগ্রাস পৃথিবীতে 70 বার কোন না কোন জায়গায় হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে

যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে, তা ঘটবে 1955 সালের 20 জুন তারিখে। সেই সময় পূর্ণগ্রাস থাকবে 7 মিনিট। 7 মিনিট 40 সেকেণ্ড হল সূর্যগ্রহণের সবচেয়ে বেশি স্থিতি।

সৌরজগৎ

গ্রহ

সূর্যের চারদিকে ঘুরছে পৃথিবী আর অন্য কয়েকটি গ্রহ। সূর্যের সব-কাছের গ্রহ হল বুধ, ক্রমে পর পর আছে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটো। এ-সব ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে প্রায় বারশ গ্রহ-কণা আছে।

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সব-কাছের গ্রহ হল এক দিকে শুক্র, অন্য দিকে মঙ্গল। শুক্র অপেক্ষা মঙ্গল আরও কাছে।

পৃথিবীর চেয়ে বড় গ্রহ আছে, ছোটও আছে। সব চেয়ে বড় হল বৃহস্পতি। আয়তনে এ পৃথিবীর প্রায় 1300 গুণ বড়।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে 365 দিনে। পৃথিবীর চেয়ে যারা সূর্যের কাছে রয়েছে তাদের ঘুরতে আরও কম সময় লাগে, বুধের লাগে 88 দিন, শুক্রের 225

দিন। অন্য দিকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে যে প্লুটো, সে আমাদের 250 বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

সূর্য থেকে গ্রহরা কত কত দূরে আছে, তার হিসেব হয়েছে। দেখা গেছে, ওই সব দূরত্বের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, একটা নিয়ম আছে।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ আছে, প্রাণী আছে। অন্য গ্রহতে কি তারা আছে? যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে বলা যায় যে পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহে আমাদের এখানকার মতো উদ্ভিদ ও প্রাণী নেই। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে মঙ্গল গ্রহে জীব আছে। যদি বা থাকে, সেখানে গোলাপ ফুল ফোটে না, কোকিল ডাকে না, ময়ূর পেখম নাচায় না, আর মানুষের মতো জীব মাথা খাটিয়ে এই বিশ্বের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত নেই। সেখানকার জল-হাওয়ায় যে রকম জীব থাকা সম্ভব সেই রকম জীবই আছে, এখানকার মতো জীব নেই। টান কম বলে হাওয়া যদি বা থাকে, খুব পাতলা হয়ে আছে। পৃথিবীর গৌরব তার আয়তনে নয়, কারণ তার চেয়েও বড় গ্রহ আছে। সে সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে 18 মাইল বেগে ঘুরছে, অন্য গ্রহও আছে যার বেগ এর চেয়েও বেশি। পৃথিবীর গৌরব তার অধিবাসিদের নিয়ে।

পৃথিবীর তো চন্দ্র আছে, পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, অন্য গ্রহের কি চন্দ্র আছে? অনেক গ্রহের চন্দ্র আছে,

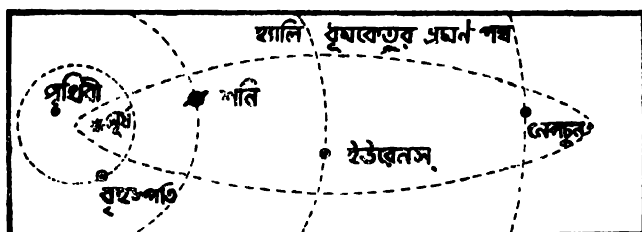
আর একের বেশি চন্দ্র আছে। বৃহস্পতি আর শনি বড় গ্রহ, তাদের চন্দ্র হল 9টি করে। তারপর ইউরেনসের চন্দ্র 4টি, এই রকম চলেছে। খুব ছোট গ্রহদের চন্দ্র নেই।

খালি চোখে আমরা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই কয়টি গ্রহকে চিনতে পারি। সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় শুক্রকে। বছরের কয়েক সপ্তাহ একে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়, তখন একে 'সাঁঝের তারা' বলা হয়। আবার কয়েক সপ্তাহ ভোর বেলায় পুব আকাশে জ্বল্‌জ্বল করতে থাকে, তখন আমরা একে 'শুকতারা' বলি, তখন আর সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে একে দেখা যায় না। মঙ্গল গ্রহ দু বছর অন্তর পৃথিবীর খুব কাছে আসে, সেই সময় একে বেশ একটা বড় লাল্‌চে জ্বল্‌জ্বলে গ্রহ বলে চেনা যায়। দুরবীন দিয়ে শনির দিকে তাকালে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়, একটা বলয় ওকে চারদিকে বেষ্টন করে রয়েছে।

ধূমকেতু

গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ। কিন্তু এই সৌর-জগতের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি অতিথি আসে, আসে কিন্তু বাস করে না, ঘুরে চলে যায়। এদের বলা হয় ধূমকেতু। ধূমকেতুদের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাল পর পর যাওয়া-আসা করে। এদের মধ্যে প্রধান হল

হ্যালির ধূমকেতু (চিত্র 7)। 1910 সালে একে আমরা দেখেছিলুম। প্রথমে ভোরের দিকে একে দেখা গেল, লম্বা একটা পুচ্ছ। দিন দিন পুচ্ছ বড় হতে থাকল, বেড়ে বেড়ে শেষে আকাশের অর্ধেক অবধি চলে গেল। তারপর কিছু সময়ের জন্য ওই পুচ্ছ পৃথিবীকে বুলিয়ে গেল। বলা বাহুল্য তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয়নি, পৃথিবীর লোক



চিত্র—৪
হ্যালির ধূমকেতুর ভ্রমণপথ

টেরও পায়নি যে পুচ্ছটা পৃথিবীর উপর দিয়ে গেল। এর পর সন্ধ্যার সময় ওকে আকাশে দেখা গেল, পুচ্ছ দিন দিন ছোট হতে লাগল, ক্রমে ওই ধূমকেতু অদৃশ্য হয়ে গেল। 75 বছর অন্তর ওই ধূমকেতু ঘুরে ঘুরে আসে।

এই ধূমকেতুটির আবিষ্কার এক আশ্চর্য কাহিনী। দুশ বছর আগে জ্যোতিষীরা মনে করতেন যে, ধূমকেতুরা এসে দেখা দিয়ে যে চলে যায় তারা আর ফেরে না। হ্যালি ছিলেন একজন বড় জ্যোতিষী, অন্য জ্যোতিষীদের একথা তাঁর মনে লাগল না। তিনি হিসেব করে দেখলেন

যে, কয়েকটি ধূমকেতু আছে যারা চিরদিনের জন্য যায় না, নির্দিষ্ট কাল পরে পরে ফিরে আসে। 1682 সালে যে ধূমকেতুকে দেখা গিয়েছিল, হ্যালি বললেন, সেইটেই 1607 সালে, আবার 1531 সালে দেখা দিয়েছিল। আর তিনি জোর করে বললেন, ওই ধূমকেতুকে 1757 সালে আবার দেখা যাবে। অন্য জ্যোতিষীরা হ্যালির কথায় অবাক হয়ে গেলেন, 1757 সালের প্রতীক্ষায় রইলেন। 1757 সাল এল, ওই ধূমকেতু দেখবার জন্যে জ্যোতিষীরা রাত্রির পর রাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কৈ, তার তো দেখা নেই। এই সময় ক্লারট নামে একজন ফরাশি জ্যোতিষী হিসেব করে বললেন,—ওই ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের খুব কাছ দিয়ে আসবে, বৃহস্পতির টানের জন্য ওর আসতে কিছু দেরি হবে। আরও দুএক মাস চলে গেল, ধূমকেতুর দেখা নেই। জ্যোতির্বিদেরা কিন্তু নিরাশ হলেন না। শেষে সেই বছর 23 ডিসেম্বর দূরবীনে ওর দেখা মিলল। কয়েক দিন পর বিরাট পুচ্ছ-সমেত ওই ধূমকেতুকে খালি চোখে দেখা গেল, হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রমাণিত হল। জ্যোতির্বিদ্‌দের আনন্দের আর সীমা নেই। কিন্তু একটা দুঃখ তাদের রয়ে গেল, হ্যালি তখন বেঁচে নেই, এর দশ বছর আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। যা হোক, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ওই ধূমকেতুর নাম রাখা হল হ্যালির ধূমকেতু।

তারপর 1835 সালে এই ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল, আবার 75 বছর পরে 1910 সালে আমরা একে দেখি, আর এই হিসেবে 1985 সালে তখনকার লোক ওকে দেখবে।

উল্কা

রাত্রে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে দেখা যায়, আকাশে এক এক জায়গায় চিড়িক চিড়িক করে এক একটা আলোর রেখা ছুটে যাচ্ছে। সাধারণ লোকে ওকে 'নক্ষত্র খসা' বলে। 'নক্ষত্র খসা' কথাটা যে একেবারে ভুল, তা সহজেই বোঝা যায়। নক্ষত্ররা তো এক একটা সূর্যের মতো। তারা যদি পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ত, তবে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

এরা উল্কাপিণ্ড। আয়তনে এরা বহু রকমের হয়। ছোট ছোট আঙুরের দানার মতোও আছে, আবার কয়েক হাজার মণ ওজনেরও আছে। 1908 সালে 30 জুন সকাল সাতটায় সাইবিরিয়ার এক জায়গায় এক খুব জ্বলজ্বলে উল্কাপিণ্ড দেখা দেয়। কোথায় গিয়ে পড়ল, 20 বছরের মধ্যে তার কোন সন্ধান মিলল না। শেষে 1927 সালে এক গভীর জঙ্গলে একে পাওয়া গেল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, যখন এ পড়ে, তখন চারদিকে 40 মাইলের মধ্যে যত গাছ ছিল সব পুড়ে যায়।

একটা উল্কা প্রচণ্ড বেগে যখন বায়ুর মধ্য দিয়ে ছোটে, তখন এ ভীষণ গরম হয়, আর শেষ অবধি জ্বলতে থাকে। সময় সময় পুড়ে ছাই হয়।

যেগুলি পৃথিবীতে এসে পড়ে, দেখা গিয়েছে, তারা প্রধানত লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরি, অন্য জিনিসও কিছু কিছু থাকে, তবে এমন জিনিস তাতে নেই যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

অনেক জ্যোতিষী মনে করেন যে এদের মধ্যে অনেকে বাইরে থেকে এসে এই সৌরজগতে ঢুকে পড়েছে, আর কতকগুলি চিরদিন এই সৌরজগতের মধ্যেই আছে, এখানেই এদের উৎপত্তি, পৃথিবী থেকে চাঁদের যেমন উৎপত্তি হয়েছে।

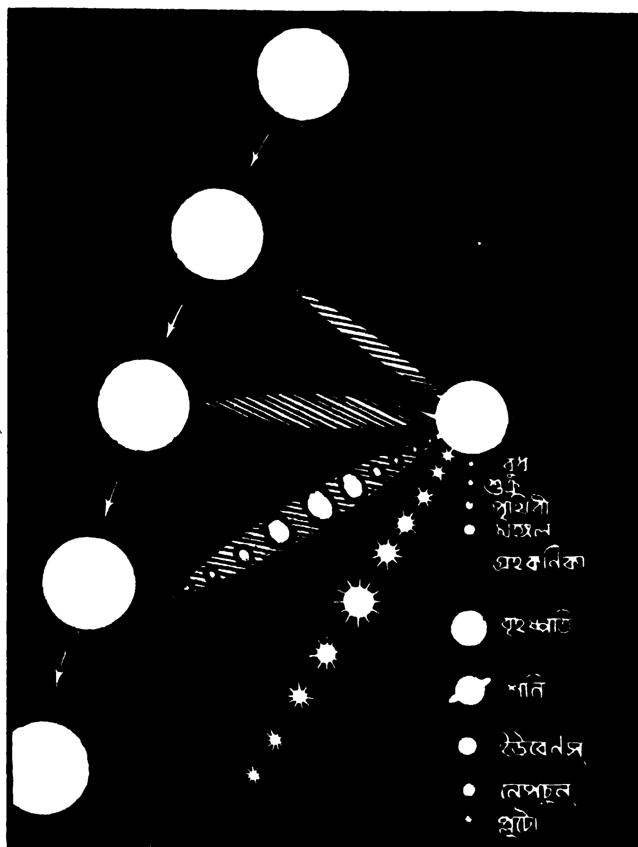
পৃথিবী

পৃথিবীর উৎপত্তি

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর দিকে চোখ ফেরান যাক।

মাটি, পাথর, জল আরও কত কি দিয়ে গড়া এই পৃথিবী! কত মানুষ, কত জন্তুজানোয়ার, কত গাছপালা কত যুগ থেকে এই পৃথিবীতে বাস করে আসছে! কিন্তু বরাবরই কি পৃথিবী এই রকমের ছিল? যদি না ছিল,

তবে কোথা থেকে পৃথিবী এল, কি রকম করে এল, কবে এল, আগে এ কি রকম ছিল ?



চিত্র—9

পৃথিবীর উৎপত্তি

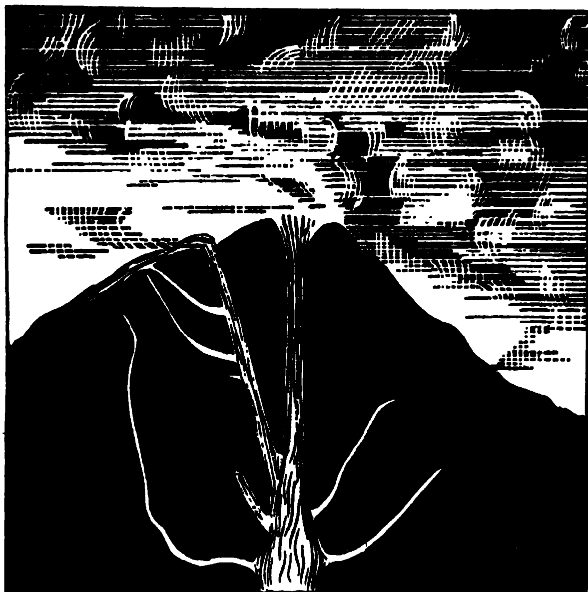
'ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' একদিন ছিল জ্বলন্ত আগুনের একটি পিণ্ড, কোথায় ছিল তখন এর উপর ভারতবর্ষ, আর তার 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা' এই বঙ্গভূমি! এ অগ্নিপিণ্ড সূর্যেরই অঙ্গীভূত ছিল, তারপর একদিন ছিট্‌কে বেরল। ছিট্‌কে এল হঠাৎ একটা ঘটনার ফলে, একদল বিজ্ঞানী এই রকম মনে করেন। তাঁদের মতে এক সময় আমাদের এই সূর্যের কাছ দিয়ে একটা নক্ষত্র চলে গেল। নক্ষত্ররা তো সূর্যেরই মতো, আর এ নক্ষত্রটা ছিল সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। দুটো বস্তুর মধ্যে টানের কথা নিউটন যা বলেছেন, সে টান সেদিনও ছিল, বরাবরই আছে। এ টানের কথায় আমরা পরে আসছি। একে বস্তুদুটি বড়, আর তার উপর তাদের মধ্যে দূরত্ব যখন খুব কমে গেল, তখন প্রচণ্ড হল তাদের মধ্যে টান। টানের চোটে সূর্যের খানিকটা অংশ সূর্যের গা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল। যে নক্ষত্রটা আসছিল সে তো দূরে চলে গেল। সূর্যের যে-অংশ বেরিয়ে এল, তার আকার হল একটা পটোলের মতো, মাঝখানটা মোটা দুধার সরু। এই গ্যাসের পিণ্ডটি ক্রমে জমাট বাঁধল, তখন ওটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। এই টুকরোগুলি হল এক একটি গ্রহ, আর এদের মধ্যে একটি হল আমাদের এই পৃথিবী। যে-নক্ষত্রটির কাছে আসবার জন্যে এরকম হল সে

এখন দূরে চলে গিয়েছে, তার টান এখন আর বড় রইল না। গ্রহগুলি আলাদা আলাদা হবার পর, অঙ্ক-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, তারা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল। এই সময় পৃথিবীর গা থেকে কিছুটা অংশ ছুটে গিয়ে এই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে রইল। এইটে হল চন্দ্র। এই অংশ চলে যাওয়ার চিহ্ন এখনও পৃথিবীর গায়ে আছে। চলে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর খানিকটা জায়গা জুড়ে প্রায় 27 মাইল গভীর একটা গর্ত হল, পরে সেটা জলে ভরে গেল। সেটা হল এখনকার প্রশান্ত মহাসাগর।

পৃথিবী ধীরে ধীরে তাপ হারাতে থাকল, একটু একটু শক্ত হতে আরম্ভ হল। নানা কারণে তার উপর চাপের মাত্রা সব জায়গায় সমান রইল না। এর ফলে পৃথিবীর এক জায়গা উঠে পড়ল, অন্য জায়গা নেমে গেল, একটা ওলোট-পালোট চলতে থাকল। যে-হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পর্বত, একদিন তার জন্ম হয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে, আর চাপের তারতম্যে সে মাথা ঠেলে উঠেছে। তাই এখনও হিমালয়ের গায়ে সমুদ্রের প্রাণীর হাড়ের চিহ্ন দেখা যায়। আমাদের বাংলাদেশও একদিন ‘সুনীল জলধি’ থেকে উঠেছিল।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়োচ্ছ্বাস

পৃথিবীর পিঠটা এখন অনেক শক্ত হয়ে এসেছে, তবু এখনও কোন কারণে কোন জায়গায় চাপ যদি বেশি হয়, তবে পাশে ফাট ধরে, ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর



চিত্র—10

আগ্নেয়োচ্ছ্বাস

অন্যান্য পর্বতের তুলনায় আল্‌প্‌স ও হিমালয় অল্পবয়সী, এদের তলার কাছ দিয়ে যে মাটি বরাবর চলে গিয়েছে, তা অন্য জায়গার তুলনায় নরম। তাই এই সকল জায়গায়

সহজে ভূমিকম্প হয়। আসাম ও বিহারের ভূমিকম্প আমরা সেদিনও দেখেছি, তার তাণ্ডব লীলার কথা ভাবলে এখনও হৃৎকম্প হয়।

পৃথিবীর উপরকার ছাল শক্ত বটে, কিন্তু এর নিচের স্তর নরম আর খুব গরম। এখানে কোন রকমে যদি গ্যাস জন্মায়, তবে তার চাপে ওখানকার নরম পদার্থ যেখানে বাধা কম পায় সেখান দিয়ে ঠেলে উপরে উঠে। এই হল আগ্নেয়োচ্ছ্বাস। পৃথিবীর কয়েকটি আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের কথা বলা যাচ্ছে।

ইটালিতে বহুকাল আগে ভেসুভিয়সের আগ্নেয়োচ্ছ্বাস যখন নিবে গেল, তখন লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ওর চারদিকে বসবাস আরম্ভ করল। এই রকম যায়। 79 খ্রীস্টাব্দে একদিন হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, আগ্নেয়োচ্ছ্বাস আরম্ভ হল। এত ভস্ম উপরে উঠল যে, দিনের আলো একেবারে নিবে গেল। চারদিকে গরম ছাই আর পাথর পড়ছে, মাটি ভীষণ দুল্‌ছে, প্রচণ্ড গর্জন, লোকের আর্তনাদ ও ঠেলাঠেলি। কত লোক যে মারা গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। পম্পিয়াই ও হারকিউলেনিয়ম শহর দুটি ভস্মস্তূপে চাপা পড়ে গেল। অনেক কাল পরে, এই গত শতাব্দীর শেষের দিকে, ওই শহর দুটিকে খুঁড়ে বের করা হল। দেখা গেল, অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বাড়ির আসবাবপত্র মায় ছবিগুলি পর্যন্ত ঠিক রয়েছে।

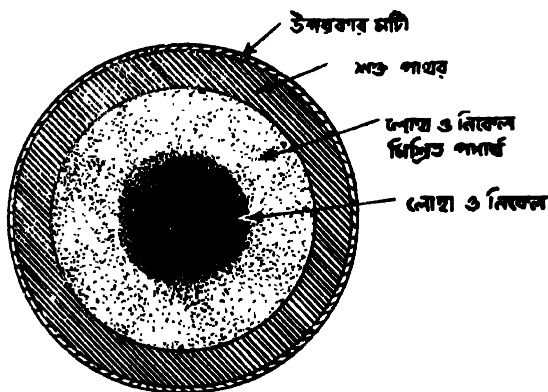
1902 সালে 8 মে তারিখে মণ্টপিলের আগ্নেয়োচ্ছ্বাস সমস্ত সেণ্টপিরি শহরটাকে পৃথিবী থেকে একেবারে মুছে ফেলে দেয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার লোক মারা পড়ে। একটি মাত্র লোক বেঁচেছিল, সে ছিল জে[illegible]র কয়েদী, মাটির তলায় একটা অন্ধকার ঘরে তাকে [illegible]ক রাখা হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আগ্নেয়ো[illegible]হয়ে গিয়েছে জাভার কাছাকাছি ক্রাকাটোয়া দ্বীপে। [illegible]গ্নেয়োচ্ছ্বাসের গোড়ায় যে শব্দটা হয় পৃথিবীতে অত জোর [illegible] কোন দিন হয়নি। 3000 মাইল দূরে সে শব্দ শোনা যায়। পাহাড়ের একটা বড় অংশ ছিট্‌কে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তাতে জলের ঢেউ 100 ফুট অবধি উঠে, আর ওই ঢেউ-এর ফলে কাছাকাছি জায়গার প্রায় 36 হাজার লোক মারা যায়, এত ধুলো উঠল যে 100 মাইল দূরেও দিন রাত্রির মতো অন্ধকার হয়ে গেল। 1883 সালে ওই আগ্নেয়োচ্ছ্বাস হয়।

পৃথিবীর উপরকার স্তর

নদী নিয়ত সমুদ্রে জল ঢালছে। কিন্তু জলের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচুর পরিমাণে চুন, নুন, মাটি, পাথর প্রভৃতি নিয়ে চলেছে। ওই সব জিনিস সমুদ্রের ভিতর স্তরে স্তরে জমা হতে থাকল, খুব বেশি চাপ দিল, এক জায়গা বেশি চাপ পেল, অন্য জায়গা উঠে পড়ল, এই করে পৃথিবীর

উপরে একটা পলি-পাথরের স্তরের সৃষ্টি হল। মাটি, বেলে-পাথর, বালির কণা, খড়িমাটি প্রভৃতি ওই পলি-পাথর থেকেই হয়েছে।

আবার পৃথিবীর ভিতরের তরল পদার্থ তাপ হারিয়ে জমাট বাঁধবার ফলে অন্যরকম পাথরের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বলা হয় আগ্নেয়-পাথর। ওরা সাধারণত পলি-পাথরের নিচে থাকে, তবে জায়গায় জায়গায় পৃথিবীর উপরের স্তরেও আগ্নেয়-পাথর উঠে পড়েছে। তাছাড়া এ দুরকম পাথর ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপও নিয়েছে।



চিত্র—11
পৃথিবীর অভ্যন্তর

পৃথিবীর উপরটা হল মাটি। প্রায় দু মাইল এই রকম চলে গিয়ছে। তারপর প্রায় 40 মাইল শক্ত আগ্নেয়-পাথর। এর পর পাথর আরও জমাট ও শক্ত হতে থাকল,

আর 800 মাইল পর্যন্ত এই রকম চলল। এর পরের হাজার মাইল লোহা ও নিকেল মিশ্রিত পদার্থ। তারপর, পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত, 2000 মাইলে আছে খাঁটি লোহা ও নিকেল। নানা প্রমাণ থেকে মানুষ এই সিদ্ধান্তে এসেছে। মাটি খুঁড়ে সে দু মাইলের বেশি যেতে পারেনি।

কয়লা ও খনিজ তেল

কয়লা জিনিসটা কি? বিজ্ঞান বলবে, এও এক রকমেব পাথর। বিজ্ঞান অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করল, এ যন্ত্র দিয়ে দেখলে খুব ছোট জিনিস বড় দেখায়, খালি চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম জিনিসকে দেখতে পাওয়া যায়। এই অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কয়লার গায়ে অনেক জাতের উদ্ভিদের চিহ্নও রয়েছে। এই সব দেখে, আর অন্যান্য প্রমাণ থেকে, বিজ্ঞান কয়লার জন্ম এই রকম স্থির করল।

পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না, তখন ছিল উদ্ভিদ। সেই সময় নানা জাতের উদ্ভিদ খুব ঘন ঘন ভাবে পৃথিবীর অনেক স্থান অধিকার করে বসেছিল। সূর্যের কিরণ পেয়ে তারা বেড়েছে। এই রকম বহু দিন চলল। তারপর এক সময় পৃথিবীর নাড়াচাড়ার ফলে ওই বন মাটি চাপা পড়ল। ধীরে ধীরে উদ্ভিদের দেহের পরিবর্তন হতে থাকল, আর শেষ অবধি সে কয়লার রূপ নিল।



আগে নিজের রান্না করা ছাড়া মানুষের তাপের খুব বেশি দরকার ছিল না, আর তখন বনজঙ্গল ছিল প্রচুর। কাঠ পুড়িয়ে সে আগুন করে নিত। তা ছাড়া তখন সে কয়লার সন্ধান পায়নি। সেদিন আর নেই। এখন মানুষের শক্তি চাই, নানা কাজে শক্তি চাই, আর এই শক্তি প্রধানভাবে সে কয়লা থেকে পাচ্ছে। তারপর কয়লা থেকে কি শুধু আমরা তাপ পাই, কয়লা অনেক কিছু দিচ্ছে। বদ্ধ বায়ুর মধ্যে পুড়িয়ে আমরা যে কয়লা-গ্যাস পাই, তা বড় বড় শহরকে আলোকিত করছে। এ সম্বন্ধে অনেক চমৎকার গল্প আছে। কয়লার গ্যাস দিয়ে যখন আলো জ্বালাবার প্রস্তাব হল, তখন লোকে শুনে তো হেসে কুটোকুটি। ওয়ালটার স্কট একটা চিঠিতে লিখলেন,—একটা পাগল নাকি প্রস্তাব করেছে যে ধোঁয়া দিয়ে সে সমস্ত লণ্ডন শহরটা আলোকিত করবে। নেপোলিঅন সাধারণত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনিও বললেন,—যা দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, তা একটা শহরের অন্ধকার দূর করবে, এ কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কয়লার গ্যাস আলো জ্বালাল, আর শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ লক্ষ আলো জ্বেলে চলেছে। কয়লাকে হঠিয়ে জায়গায় জায়গায় যা আলো জ্বালবার ভার নিল তাকে দেখা তো যায় না, তার কোন গন্ধও নেই কয়লা-গ্যাসের যেমন আছে। সে হল তড়িৎ।

কয়লা থেকে গ্যাস তৈরি করবার সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেতে থাকল আলকাতরা। এই আলকাতরা থেকে বিজ্ঞানী তৈরি করল নানা রকমের রং, নানা রকমের ওষুধ। আর আশ্চর্য এই, এই কালো থক্‌থকে চট্‌চটে দুর্গন্ধ আলকাতরা থেকে নানা রকমের সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। স্যাকারিন, যা চিনির অনেকগুণ বেশি মিষ্টি, তাও এই আলকাতরার দান। আজকাল 'সলফাড্রাগ' বলে কয়েক রকমের ওষুধ চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর এনেছে। তাদেরও মূলে আছে ওই আলকাতরা।

মাটির তলা থেকে কয়লা ছাড়া কেরোসিন তেল ও পেট্রল মিলল। যেদিন সস্তায় কেরোসিন তেল পাওয়া গেল, সেদিন থেকে আলো জ্বালবার জন্যে সরিষার তেল, নারিকেল তেল, রেড়ির তেল প্রভৃতির ব্যবহার একেবারে কমে গেল। অন্য দিকে পেট্রল এঞ্জিন চালাচ্ছে, সেই এঞ্জিন ডাঙায় মোটর-গাড়ি, জলে স্টিমার, আকাশে এরোপ্লেন ছোটাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা উঠেছে।

আজ মানুষ পৃথিবীর চেহারাটা একেবারে বদলে দিয়েছে। কোটি কোটি মাইল রেল লাইনের উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ এঞ্জিন ছুটেছে, জলে হাজার হাজার স্টিমার চলেছে, আকাশে এরোপ্লেনের সংখ্যা, মাটির উপর মোটর-গাড়ির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কত রকমের কত কারখানা কত জায়গায় গড়ে উঠেছে। এ সবই প্রায় চলেছে কয়লা, তেল

বা পেট্রল দিয়ে। কিন্তু অল্প অল্প করে নিলেও কলসির জল শেষ হয়। আর কয়লা, তেল, পেট্রল আমরা তো খুব অল্প অল্প করেও নিচ্ছি না, একদিন তো ওদের শেষ হবে। তখন কি মানুষের সভ্যতা দৌড়তে দৌড়তে চলে ফস্ করে একেবারে থেমে যাবে! কয়লা, তেল, পেট্রল তো অনেক দিনের সঞ্চয় করা জিনিস, ফরমাস করে তো তাদের চট্ করে তৈরি করা যায় না। যেদিন ওসব জিনিস ফুরবে, সেদিন মানুষের কি উপায় হবে! সে কথা মানুষ ভাবছে, কিছু কিছু উপায়ও বেরিয়েছে। এক রকম উপায়ে পাওয়া শক্তির কাজ দেখা গেল গত যুদ্ধের সময়, যখন ছোট্ট একটু পদার্থ শক্তির রূপ নিল, আর সেই শক্তি নিমেষের মধ্যে জাপানের তুটি বড় শহরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলল।

পৃথিবীর বয়স

পৃথিবীর বয়স কত হল, বিজ্ঞান কি তার একটা হিসেব দিতে পারে?

যার জন্ম হয়েছে মানুষ আসবার অনেক কোটি বছর আগে, তার জন্মের সন তারিখ কে দেবে? সন তারিখ দেওয়া সম্ভব না হলেও কোন্ যুগে পৃথিবীর সৃষ্টি হল, যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান তার একটা হিসেব দিয়েছে। সে হিসেবে দাঁড়ায় পৃথিবীর বয়স প্রায় 300 কোটি বছর।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়, পৃথিবীর কি কোনদিন ধ্বংস হবে, আর যদি হয় তো সে কবে? এ-দিকেও বিজ্ঞানের হিসেব হল এই যে, পৃথিবী আরও প্রায় 300 কোটি বছর বাঁচবে। আমাদের এখনকার পৃথিবী একটি আধবয়সী লোক।

পৃথিবীর আকর্ষণ

1610 সাল, 7 জানুয়ারি। গ্যালিলিও সেই দিন প্রথম তাঁর নিজের তৈরি দুরবীন দিয়ে আকাশের দিকে



চিত্র—12

গ্যালিলিও

তাকালেন। তিনি বৃহস্পতি গ্রহ লক্ষ্য করলেন, দেখলেন

ওই গ্রহের কাছে তিনটি ছোট ছোট নক্ষত্র রয়েছে। পরের রাত্রে আবার তিনি ওই নক্ষত্র তিনটি দেখতে পেলেন, কিন্তু এবার তারা বৃহস্পতির অন্য দিকে চলে গিয়েছে। রাতের পর রাত গ্যালিলিও ওদের দেখে চললেন, কখন দেখেন দুটি, কখন তিনটি, আবার চারটিও দেখেন। আসলে তিনি যাদের দেখছিলেন তারা নক্ষত্র নয়, বৃহস্পতির চাঁদ, আমাদের পৃথিবীর যেমন চাঁদ আছে তেমনি, তবে দলে ভারি। এখন পৃথিবী যদি স্থির থাকত, আর আকাশের দীপগুলো যদি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরত, তাহলে বৃহস্পতির চারটি চাঁদকে বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরতে দেখা যেত না, তারা পৃথিবীর চারদিকেই ঘুরত। সুতরাং গ্যালিলিও আর তাঁর আগে দু একজন যাঁরা বলেছিলেন যে সূর্যকে বেষ্টন করে পৃথিবী ও গ্রহরা ঘুরছে, গ্যালিলিওর দূরবীন তাঁদের কথাই প্রমাণ করল।

কিন্তু অপর দলের লোক একটা কথা তুললেন। তাঁরা বললেন, সূর্যকে বেষ্টন করে যদি পৃথিবী আর অন্য গ্রহরা ঘোরে, তবে চাঁদের যে-রকম হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়, শুক্র গ্রহেরও সেই রকম হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যাবে, আর ওই গ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে আসবে, তখন তাকে অপেক্ষাকৃত বড় দেখাবে। গ্যালিলিও পরে সবচেয়ে যে বড় দুরবীন তৈরি করলেন, তা দিয়ে শুক্রের হ্রাসবৃদ্ধি দেখা গেল, আর ওই গ্রহ যখন পৃথিবীর খুব কাছে এল, তখন তাকে বড়ই

দেখাল। আর কোন সন্দেহই রইল না যে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও অন্য গ্রহরা ঘুরছে।

গ্যালিলিও মারা গেলেন 1642 সালে, আর সেই বৎসর নিউটন জন্মালেন। নিউটন যে সময় জন্মালেন, সে



চিত্র—13
নিউটন

সময় প্রমাণ হয়ে গেছে যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু কেন যে ঘুরছে তার মীমাংসা হয় নি। নিউটন এর উত্তর দিলেন।

গল্পে আছে, একদিন শরৎকালের সন্ধ্যায় নিউটন তাঁর বাগানে বসে ওই সব কথা ভাবছিলেন। সন্ধ্যা হল,

আকাশে চাঁদ উঠল। নিউটন চিন্তা করতে লাগলেন,—এই যে চাঁদ উঠছে, এ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, কিন্তু কেন ঘুরবে? এমন সময় সামনে গাছ থেকে একটা আপেল ফল পড়ল, নিউটন পড়ার শব্দ শুনলেন। যে-প্রশ্ন এতদিন ধরে নিউটনকে বিব্রত করছিল, এখন হঠাৎ তার উত্তর নিউটনের মনে জাগল। পৃথিবী টানছে বলে ওই আপেল ফল মাটিতে পড়ল। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে এই যে আকর্ষণ, তা কি চাঁদকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাতে পারে না! একটা ঢিলকে যদি দড়ি বেঁধে ঘোরান যায়, তবে ঢিলটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, দড়ির টান ঢিলকে ঘোরায়। নিউটন ঠিক করলেন, ঠিক এই রকমে পৃথিবীর টান চাঁদকে ঘোরায়। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণের জন্যে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, আর একই কারণে গ্রহরাও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

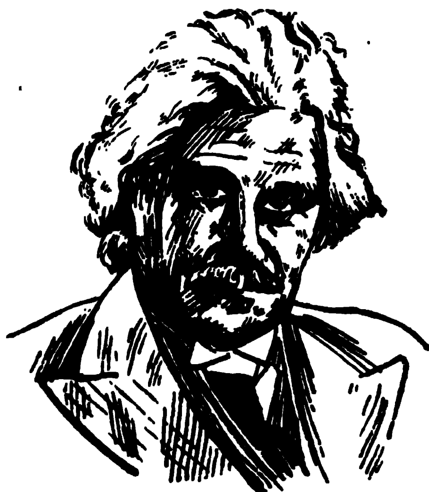
নিউটন বললেন,—ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে টানছে, জিনিস দুটোর বস্তু যত বেশি টান তত বেশি, আবার জিনিস দুটো যত কাছাকাছি থাকবে টানের মাত্রা তত বাড়বে। এই মহাকর্ষ নিয়ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যেপে কাজ করছে।

নিউটনের পর এই নিয়ম সম্বন্ধে লোকের একবার একটু সন্দেহ জাগল। নিউটনও দেখেছিলেন, আর

নিউটনের পর আরও অনেক জ্যোতিষী লক্ষ্য করলেন যে, মহাকর্ষ নিয়ম অনুসারে ইউরেনস-গ্রহের যে-পথে চলা উচিত, ওই গ্রহ ঠিক সেই পথে চলে না। তবে কি নিউটন যে মহাকর্ষ নিয়মের কথা বলেছিলেন, সেই নিয়মের কোথাও কিছু গলদ আছে ? অবশ্য এমনও হতে পারে যে, আকাশে অন্য একটি গ্রহ আছে যার জন্য ওই রকম ঘটছে, আর তখনও অবধি সেই গ্রহের কোন খোঁজ মেলেনি। তা যদি হয়, তবে সেই অজানা গ্রহ কোথায় আছে, কত দূরে আছে, তার বস্তু কত, কোন্ পথে সে চলে, এ-সব একজন ইংরেজ জ্যোতিষী আর একজন ফরাশি জ্যোতিষী পৃথক-ভাবে অঙ্ক কষে বের করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বার্লিন মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, আকাশের ঠিক অমুক জায়গায় ভাল দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করলে ওই অজানা গ্রহের সন্ধান মিলতে পারে। প্রকৃতির একটি ঘটনাকে বোঝবার জন্যে মানুষের সসীম মন অসীম ব্রহ্মাণ্ডের নানারকম কলকব্জার মধ্যে একখানি চাকার একটি দাঁতের সন্ধান পেল, নেপচুন-গ্রহ আবিষ্কৃত হল। মহাকর্ষ নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই মহাকর্ষ ব্যাপারকে অন্যভাবে, অন্যরূপে প্রকাশ করেছেন।

প্রকৃতিতে যত রকম বলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তার মধ্যে এই মহাকর্ষ বল সব চেয়ে ব্যাপক।

কতদূর অবধি এই বল কাজ করছে, এর আর সীমা নেই। সূর্য থেকে আলো আসছে, মধ্যে একটা অনচ্ছ জিনিস ধরে আমরা সূর্যের আলোকে ঢাকতে পারি। তাপও রোধ



চিত্র—14
আইনস্টাইন

করতে পারি। চুম্বকের কাজও নাকচ করতে পারি। কিন্তু কোন রকমে কোন উপায়ে এই মহাকর্ষ বলকে রহিত করতে পারিনে। ব্রহ্মাণ্ডে বহু বহু দূরে ওই যে নক্ষত্র রয়েছে, ওই নক্ষত্র ও আমাদের পৃথিবীর মধ্যে একটা আকর্ষণ চলেছে, পৃথিবী কেন, আমার দেহের সঙ্গেও একটা টানাটানি চলেছে। অবশ্য আমার দেহের সঙ্গে যে

আকর্ষণ, তা এত কম যে তাকে আর ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না, কিন্তু সে যে আছে তা তো বলতে হবে। মাটি থেকে একটা ঢিল তুললুম, একথা স্বীকার করতেই হবে যে এর জন্য পৃথিবী যে পথে চলছিল সে পথের পরিবর্তন ঘটল, অবশ্য মানতে হবে যে তার পরিমাণ এত কম যে তা কল্পনায়ও আনা যাবে না।

একবার ভাবা যাক, আমাদের পৃথিবী অন্য পদার্থকে যে টানছিল, কাল সকাল থেকে তা আর থাকবে না। তখন কি দেখব? সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দেখব, কলসি থেকে জল পড়ে না, কলসি একেবারে উপুড় করলেও না। কলে জল আসছে না, পর্বত থেকে নদী নামছে না। এদিকে ঘড়ির দোলক বন্ধ। দোকানদার মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছে, দাঁড়িপাল্লায় চাল এক মুঠো দাও বা একমণ দাও, পাল্লার অবস্থা একই। শিশুরা ল্যাজ ধরে বোঁ বোঁ করে হাতি ঘোরাচ্ছে, হাতির আর কোন ভার নেই। তড়্‌তড় করে তারা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, পড়বার ভয় নেই। কিন্তু অতদূর এগুতে হবে না, তার আগে অনেক কিছু ঘটবে। আমরা দাঁড়াতে পারব না, চলতে পারব না, আর কোথায় ছট্‌কে চলে যাব তার ঠিক নেই।

নিউটন যে শুধু এই মহাকর্ষ তত্ত্বের কথা বললেন তা নয়, তিনি বিজ্ঞানের নানা দিকে নানা আবিষ্কার করলেন।

তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজ কবি পোপ লিখেছিলেন,— প্রকৃতির নিয়ম অন্ধকারে ছিল, ঈশ্বর বললেন, নিউটন আসুক! নিউটন এলেন, আর সমস্ত আলোকিত হল। প্রুশিয়ার রানী নিউটন সম্বন্ধে সেই সময়কার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ



চিত্র—15

শিশু হাতি ঘোরাচ্ছে

লিব্‌নিজকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। লিব্‌নিজ বললেন,—পৃথিবীর আরম্ভ থেকে নিউটনের সময় পর্যন্ত

পৃথিবীর সমস্ত গণিতজ্ঞরা মিলে যা দিয়ে গেছেন তা যদি এক পাল্লায় থাকে, আর নিউটনের দান যদি অন্য পাল্লায় থাকে, তবে নিউটনের দিকটাই ঝুলে পড়ে।

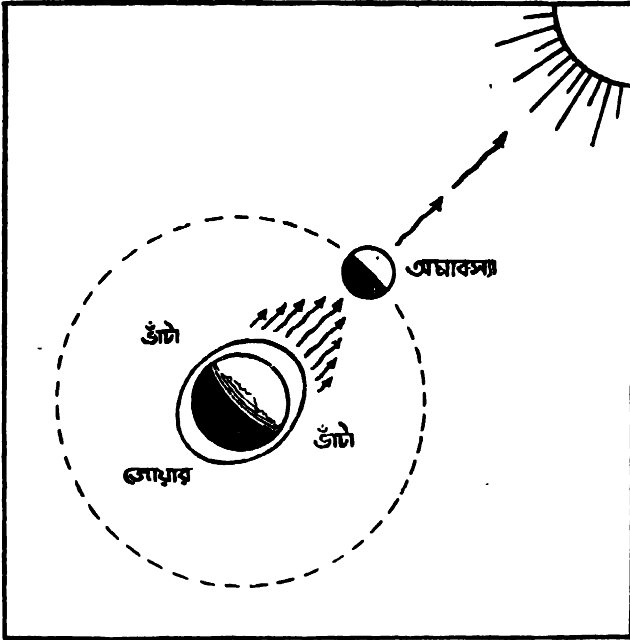
এর পর তিনশ বছরেরও বেশি চলে গিয়েছে, তবুও একথা সকলে বলবে যে আজও সকল দেশের সকল কালের সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউটনের স্থান সকলের উপরে।

অথচ এই নিউটনই বৃদ্ধবয়সে একদিন বলেছিলেন,—আমি তীরে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলের মতো খেলা করে গিয়েছি, কখনও একটি ঘষা পাথর কুড়িয়েছি, কখন একটা চক্‌চকে শামুকের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু জ্ঞানের বিরাট সমুদ্রের কোন খবর পাইনি।

জোয়ার-ভাঁটা

প্রধানত চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে টানের জন্যে জোয়ার ভাঁটা হয়। পৃথিবীর যে অংশে মাটি, সেই অংশ যদি চাঁদের দিকে থাকে তবে ওই টান বোঝা যাবে না, কিন্তু যে অংশে জল রয়েছে, সেই অংশ চাঁদের দিকে আসলে চাঁদের টানে সেখানকার জল ফুলে উঠবে, সেখানে জোয়ার হবে। পৃথিবীর উল্টো দিকেও তেমনি জল ফুলে উঠে জোয়ার হবে। আর, এক জায়গায় জল ফুলে উঠলে অন্য জায়গায় জল নেমে যাবে, নেমে গেলে সেখানে হবে ভাঁটা। পৃথিবীতে সমুদ্রের জলে, নদীর জলে অবিরাম এই রকম চলেছে। চন্দ্রে যদি

জল থাকত তবে সেখানেও এই রকম চলত, কারণ চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবীও তেমনি চন্দ্রকে টানছে। কিন্তু



চিত্র—16

জোয়ার-ভাঁটা

সূর্যের টানের জন্যেও কি জোয়ার-ভাঁটা হয়? হয়, তবে কম। সূর্য এত বেশি দূরে যে এই টান একেবারে কমে গিয়েছে। তবে দেখা গিয়েছে সূর্য ও চন্দ্র এক দিকে থেকে যখন সমুদ্রের জলকে টানে তখন জোয়ার যতটা বেশি হয়, সূর্য ও চন্দ্র দুই বিপরীত দিক থেকে টানলে ততটা হয় না।

জীব

জীবের ক্রমবিকাশ

কবির সঙ্গে আমরাও বলি—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ-মণ্ডল, অসংখ্য রজনী-দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলদল গন্ধরেণু।" (রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু একদিন তো ছিল যখন এই পৃথিবী ছিল একটি জ্বলন্ত পিণ্ড, তখন মানুষ তো দূরের কথা, একটি ঘাসেরও সেখানে জন্মান সম্ভব ছিল না। এই জ্বলন্ত পিণ্ড ক্রমে ক্রমে তাপ হারাল, জমাট বাঁধল, তার উপর জলরাশি দেখা দিল। কিন্তু উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ পশু পাখি মানুষ এখানে কবে এল, কি রকম করে এল?

আমরা পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ দেখি তাদের

দু শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, জীব ও জড়। যাদের জীবন আছে, যেমন কীট পতঙ্গ পশু পাখি মানুষ,—এরা জীব। উদ্ভিদের জীবন আছে বলে একেও জীবের মধ্যে ধরা হয়। আর মাটি পাথর জল প্রভৃতি যাদের জীবন নেই, তারা জড়। কিন্তু জীবন বলতে কি বোঝায়? বলা শক্ত, আমরা শুধু বলতে পারি কার জীবন আছে। জীবন বলতে কতকগুলি কাজের কথা আমাদের মনে আসে, খাওয়া-দাওয়া করা, নড়াচড়া করা, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, বংশবিস্তার করা, এই রকম। বিজ্ঞানের কৃতিত্ব অনেক, কিন্তু একটা কাজ বিজ্ঞান আজও পারেনি, জড়কে সে জীবে পরিণত করতে পারেনি। গাছ থেকেই গাছ জন্মায়, মানুষ থেকেই মানুষ হয়, পাথরকে গাছ বা মানুষ করা যায় না। একদিন এই পৃথিবী কেবল জড়ময় ছিল, কোন রকমের কোন জীবের অস্তিত্ব এখানে সম্ভব ছিল না। এই জড়ময় পৃথিবীতে জীব প্রথম কোথা থেকে এল, কি ভাবে দেখা দিল? এর কোন সদুত্তর বিজ্ঞান আজও দিতে পারেনি।

অণুবীক্ষণ দিয়ে জীবের শরীর লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইটের পর ইট সাজিয়ে যেমন আমাদের বাড়ি, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল দিয়ে সাজান জীবের দেহ। এই সেল হল থলথলে একটু পদার্থ। পৃথিবীর প্রথম প্রাণী দেখা দিল জলে, তার ছিল একটি মাত্র এই রকমের সেল। নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই প্রাণী শেষ অবধি কি করে

মানুষে গিয়ে দাঁড়াল, যার দেহ কোটি কোটি সেল দিয়ে তৈরি, সে ইতিহাসটুকু হল মোটামুটি এই। অবশ্য এর আগে উদ্ভিদ আলাদা হয়ে গেছে।

প্রত্যেক প্রাণীকে খাবার যোগাড় করতে হবে, আর সে জন্যে তাকে এক জায়গায় থাকলে চলবে না, এক জায়গায় থাকলে পাশের খাবার তো শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফুরিয়ে যাবে। গোড়ায় যে প্রাণী জলে দেখা দিয়েছিল, সে তার শরীরের এমন ব্যবস্থা করতে লাগল, যাতে সে নতুন নতুন জায়গা থেকে খাবার যোগাড় করতে পারে, আবার পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই তার শরীর জলে চলাফেরা করবার মতো হল। এদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী উদ্ভিদের তৈরি খাবার খেয়ে, অথবা সোজাসুজি একেবারে উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করল। তাহলে উদ্ভিদ ও প্রাণী এ দু-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় তফাৎ রইল এই, উদ্ভিদ জড় থেকে তার খাবার তৈরি করে নিতে পারে, প্রাণী তা পারে না, সে উদ্ভিদের তৈরি খাবার বা সোজাসুজি উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে।

অপরকে ধরে খেতে হবে বলে প্রাণীর মুখ ও পাকস্থলী গড়ে উঠল, হজমের ব্যবস্থা হল। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের পথ তৈরি হল, শেষ অবধি ফুস্‌ফুস দেখা দিল। এদিকে হজমের বাকি জিনিস ত্যাগ করবার জন্য নানারকম শরীর-যন্ত্রের সৃষ্টি হতে থাকল। এই রকমে

ক্রমে ক্রমে দেহ ও তার কাজ করবার ব্যবস্থা যখন জটিল হয়ে উঠল, তখন সমস্ত যন্ত্রকে চালনা করবার জন্যে মস্তিষ্ক ও নার্ভ দেখা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হতে থাকল।

এদিকে গাছপালাও পৃথক হয়ে ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করতে লাগল, জল ছেড়ে সে ডাঙায় উঠল। কিন্তু ক্রমশ তার চলবার শক্তি লোপ পেল, তবে এক জায়গায় বসে সে খাদ্য তৈরি করতে পারল। সে মাটির ভিতর নানাদিকে শিকড় চালাল, আলোতে ডালপালা ছড়িয়ে দিল, দেহকে বাড়াতে লাগল, এক-সেলওয়ালা জীব কালক্রমে কোটি কোটি সেলযুক্ত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হল। এখন সে পাতা বের করল, ফুল ফোটাল, ফল ধরল, শেষ বীজ দিয়ে তার বংশবিস্তার করল।

আদিম জীবের এই সব পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে আশেপাশের অবস্থা ও বাইরের ঘটনার প্রভাবে। আজ পৃথিবীতে চোখ কান নাক হাত পা-ওয়ালা সুন্দর সুন্দর প্রাণী বিচরণ করছে, বাহুবলে অন্যান্য প্রাণীকে হারিয়ে দিচ্ছে, বুদ্ধিবলে একে একে প্রকৃতির নিয়ম সব জানছে, আর নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করছে, এই পৃথিবীর উপর নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করছে। কিন্তু মানুষ চিরদিন তার এই আকার এই শক্তি এই বুদ্ধি নিয়ে বিচরণ

করে নি। একদিন ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, ছিল ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ ও জন্তুজানোয়ার। আর কালস্রোতে যে প্রাণী বাইরের ঘটনা-প্রবাহে ধীরে ধীরে আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন করতে করতে শেষ অবধি মানুষের আকার নিয়েছে, আমাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগলেও স্বীকার করতে হবে যে সে-প্রাণী ছিল বানর জাতীয়। অবশ্য ঠিক যে বানর বা বনমানুষ থেকে মানুষ এল তা নয়, এই তিন জাতিরই এক পূর্বপুরুষ ছিল। আরও বেশি পিছু হঠলে দেখা যাবে, জীবশ্রেষ্ঠ মানব শেষ অবধি পরিণতি লাভ করেছে এক এক-সেলওয়ালা জীব থেকে।

কিন্তু বিজ্ঞানের দুঃসাহস আছে, নানা রকমের জীব কে কবে পৃথিবীতে এল, তার একটা হিসেব করে ফেলল। তার মোটামুটি হিসেব এই, পৃথিবীতে জীব আসে 50 কোটি বছর আগে, মাছ এসেছে 40 কোটি বছর আগে, 30 কোটি বছর আগে গাছ দেখা দিল, পাখি এল 12 কোটি বছর আগে, আর মানুষ এসেছে এই সেদিন, 3 লক্ষ বছর আগে।

যে কবির কথা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, সেই কবির আর এক অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাক—

"এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল

নূতন ; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটা পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানের উৎপত্তি

হাতি মানুষের চেয়ে কত বড় একটা প্রাণী, কি প্রচণ্ড তার শক্তি! একটা বাঘ, একটা সিংহ, একটা ভাল্লুক মানুষকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু মানুষ হাতিকে পোষ মানাল, বাঘ সিংহ ভাল্লুককে খাঁচার মধ্যে পুরল, ঘোড়াকে দিয়ে গাড়ি টানাল, গোরুকে দিয়ে মাটি চষাল। কি করে মানুষ এসব পারল! ওই সব জন্তুর চেয়ে মানুষ দেহের শক্তি পেয়েছে কম, কিন্তু বুদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে পৃথিবীর সকল জীবকে হার মানাল, বাইরের সঙ্গে যুদ্ধে সে নিজেকে জয়ী করল। এই বুদ্ধি আর বিচারশক্তি থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

চড়ুই পাখি দশ হাজার বছর আগে যে ভাবে বাসা বাঁধত, আজও ঠিক সেই রকমে বাসা বাঁধে, কিন্তু মানুষ দীর্ঘকাল গুহার মধ্যে নিজেকে আট্‌কে রাখতে চাইল না। অবশ্য ভুবনেশ্বরের মন্দির বা আগ্রার তাজমহল তৈরি করবার ক্ষমতা লাভ করতে তার বহু যুগ লেগেছে, আর তার অট্টালিকাগুলিকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করতে অনেক কাল চলে গিয়েছে। বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

সে প্রথমে গাছের ডাল বেঁকিয়ে ধনুক তৈরি করল, পাথর ভেঙে নানা রকম অস্ত্র প্রস্তুত করল। এই ধনুক-বাণের



চিত্র—17

গাছের ডাল বেঁকিয়ে ধনুক তৈরি করল

যুগ থেকে আজ কামান বন্দুক অ্যাটম-বোমার যুগে পৌঁছতে তার অনেক দিন গিয়েছে। কিন্তু যেদিন মানুষ



চিত্র—18

কাঠ ঘষে আগুন জ্বালল

দুখানা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালল, ধনুকে ছিলা পরাল, বিজ্ঞানের আবির্ভাব হল সেদিন।

বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

রাজা বললেন,—আমার হাতিটা ওজন করে দাও। সভাসদেরা হতভম্ব! এমন দাঁড়িপাল্লা কোথায়, যাতে হাতিকে ওজন করা যায়! একজন এসে বললেন,—আমি ওজন বের করে দিচ্ছি। বলে হাতিটাকে নিয়ে গিয়ে একটা বড় নৌকায় তুললেন। হাতির ভারে নৌকা জলে খানিক নেমে গেল। নেমে গিয়ে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে তিনি একটা দাগ কাটলেন। এখন হাতিটাকে নামিয়ে নিয়ে নৌকায় ইট-পাটকেল বোঝাই করতে লাগলেন, যতক্ষণ না নৌকা জলে আবার সেই দাগ অবধি নামে। এইবার একটা ছোট পাল্লায় ইট-পাটকেলগুলো ওজন করলেন। সেইটেই তো হাতির ওজন।

আর এক দেশের এক রাজা ভারি চমৎকার একটা মুকুট তৈরি করালেন। কিন্তু রাজার কেমন সন্দেহ হল, স্যাকরা সোনার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে দিয়েছে। কি করে জানা যায়! মুকুটটা তিনি ওজন করলেন, দেখলেন স্যাকরাকে যতটা সোনা দেওয়া হয়েছিল, মুকুটটার ওজন ঠিক তাই আছে। রাজা মনে করলেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু সভাসদ্‌দের মধ্যে একজন বলল যে, স্যাকরা হয় তো কিছু সোনা নিয়ে নিয়েছে, আর তার বদলে ঠিক সেই ওজনের রুপা মিশিয়ে দিয়েছে। রাজা ভাবলেন,—তাও তো হতে পারে! কিন্তু তিনি ধর্মভীরু লোক ছিলেন,

প্রমাণ না পেয়ে স্যাকরাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চান না। এখন কি করে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ওটা খাঁটি-সোনা, বা সোনাতে অন্য সস্তার ধাতু মেশান হয়েছে। বিজ্ঞানীর ডাক পড়ল। বিজ্ঞানী এসে কয়েক দিনের সময় নিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ি গিয়ে বিজ্ঞানী সমান আয়তনের দুখানা চাকতি তৈরি করলেন, একখানা সোনার, অপরখানা রুপার। ওজন করে দেখলেন যে, সোনার চাকতি রুপার চাকতির প্রায় দুগুণ ভারি, যদিও তাদের আয়তন এক। এখন তিনি ভাবলেন যে মুকুটটাকে গালিয়ে যদি একটা চাকতি বানান যায়, আর ঠিক সেই আয়তনের খাঁটি সোনার একটা চাকতি যদি নেওয়া হয়, আর যদি দেখা যায় যে চাকতি দুখানার ওজন এক, তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই মুকুটটা সোনার। আর যদি তা না হয়, তবে জানতে হবে সোনাতে অন্য ধাতু মেশান হয়েছে। কিন্তু একটা মুস্কিল তো রইল। মুকুটটা অনেক যত্ন করে তৈরি, ওতে অনেক সূক্ষ্ম কাজ রয়েছে, গলালে তো সব গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, না গলিয়ে কি করে ওর আয়তন বের করা যায়। ভাবছেন, ভাবছেন,—একদিন স্নান করতে গিয়েছেন, চৌবাচ্চা জলে কানায়-কানায় ভর্তি। তিনি জলে নামলেন, খানিক জল উপচে পড়ল। একেবারে ডুব দিলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন, দেখলেন জল আর কানায়-কানায় নেই, খানিকটা

নেমে গিয়েছে। তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর দেহের যে আয়তন নিশ্চয় সেই আয়তনের জল উপচে পড়েছে। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন,—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।

তিনি একটা পাত্রে কানায়-কানায় জল নিলেন, তার পর মুকুটটি তার মধ্যে ছেড়ে দিলেন, খানিকটা জল উপচে পড়ে গেল। যতটা জল পড়ে গেল তার আয়তন মাপলেন। নিশ্চয় সেটা হল মুকুটের আয়তন। এখন তিনি ওই আয়তনের খাঁটি সোনার একটা চাকতি তৈরি করালেন। দেখলেন মুকুটের চেয়ে ওই চাকতির ওজন বেশি, অথচ দু-এর আয়তন সমান। তাহলে নিশ্চয় মুকুটটা খাঁটি সোনার নয়। রাজা স্যাকরাকে ডেকে পাঠালেন, স্যাকরা তার দোষ স্বীকার করল। রাজা আর সভাশুদ্ধ লোক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জয়গান করলেন।

মানুষের দেহের শক্তি কম, বুদ্ধি খাটিয়ে সে বেশি শক্তি পাবার চেষ্টায় রইল। আগুন জ্বালতে পারার পর সে ধাতু গলাবার চেষ্টা করল, অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর সে ধাতুকে গলাতে পারল। লোহা গলিয়ে সে বল্লম ছোরা প্রভৃতি তৈরি করল, বনের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাল। অনেক জন্তুজানোয়ারকে সে বশে আনল, নিজের কাজে লাগাল। আদিম কালের মানুষ এই রকম করে তার শক্তি বাড়াল। ঘোড়া গোরুকে দিয়ে

সে জমি চষল, ঘোড়া গোরু এক জায়গা থেকে তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল, তার মালপত্র বইল। এই রকম চলল।

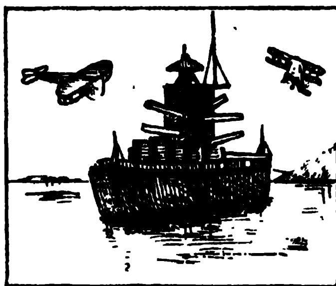
এই দীর্ঘ কালের ইতিহাসে প্রকৃতি থেকে শক্তি-সংগ্রহ ছিল অল্প, মানুষ মানুষকে জীবজন্তুকে খাটিয়েছে বেশি। শুনা যায়, পিরামিডকে সম্পূর্ণ করার মূলে ছিল এক লক্ষ লোকের কুড়ি বৎসরব্যাপী পরিশ্রম। কল্পনায় এ চিত্রও এসে পড়ে যে, এই কর্মীদের পিঠের উপর উঁচানো ছিল তাদের প্রভুদের চাবুক।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

অনেক দিন আস্তে আস্তে চলবার পর শেষের দিকে বিজ্ঞানের গতি খুব দ্রুত হল, নানা দিকে সে চলল, আর জোরে দৌড়তে থাকল।

মানুষ তাপের শক্তিকে কাজে লাগাল। ওআটের তৈরি বাষ্পীয় এঞ্জিন যেদিন লোকজন মালপত্র নিয়ে দৌড়তে রইল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেদিন এক গৌরবময় যুগ দেখা দিল। বহু প্রাচীন যুগে মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালল, তার সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হল সেদিন, আর বাষ্পীয় এঞ্জিন যেদিন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কাজ আরম্ভ করল, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেদিন এক বিপ্লব এল। হাজার হাজার বছর

আগে সূর্যের যে তেজ নিজেকে কয়লার মধ্যে আটকে রেখেছিল, আজ তা মুক্ত হয়ে মানুষের সেবায় নিযুক্ত হল, সৌরজগতের এই গ্রহ পৃথিবী মানুষের বাসের পক্ষে মনোরম হয়ে উঠল। কয়লার মধ্যে শক্তি তো অনেক কাল



চিত্র—19

স্টিমার ছুটল, এরোপ্লেন উড়ল

থেকেই ছিল, এখন মানুষ সেই শক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে এনে বিপুল শক্তিশালী হল। কয়লা ছাড়া তেলের শক্তিকেও কাজে লাগান হল, মোটর-গাড়ি দৌড়ল, স্টিমার ছুটল, এরোপ্লেন উড়ল।

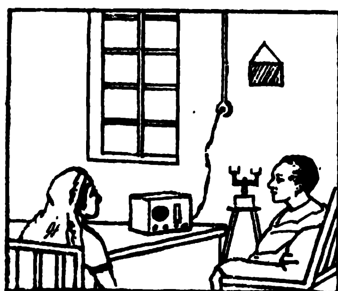
পৃথিবীতে এই যে নতুন যুগের আবির্ভাব হল, তা কি শুধু মানুষকে ভালভাবে খাওয়াল পরাল? তা মানুষের সভ্যতাকে জোর ঠেলা দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে দিল। দেশের সঙ্গে দেশের ব্যবধান ঘুচল, বিভিন্ন দেশের মধ্যে চিন্তাধারার আদান-প্রদান চলল, শিক্ষা ছোট গণ্ডি ছাড়াল।

এর পর এল বিদ্যুতের যুগ। কয়লার কাজ শেষ হল না, কিন্তু তড়িৎশক্তি নানাভাবে নানা দিক দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগল।

আজ তড়িৎ পৃথিবীর রূপ এমনি বদলে দিয়েছে যে, একশ বছর আগে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে এই রকম লোককে যদি এখন এখানে আনা যেতে পারত, তবে সে চিনতে পারত না যে এই পৃথিবীতে সে একদিন বাস করে গিয়েছে। একটা বোতাম টিপলুম, তড়িৎ আমার সেবায় নিযুক্ত, অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল আলোকে ভরে গেল, ঘর্মাক্ত আমার শরীর, মাথার উপর পাখা ঘুরতে লাগল। 50-60 বছর আগেও 50 মাইল দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হলে তার কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এখন শুধু টেবিলের উপর থেকে যন্ত্রটা তুলে মুখের সামনে ধর, আর পৃথিবীর অপর প্রান্তের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বল। তড়িতের সাহায্যে এক্‌স-রশ্মির উদ্ভব হল, তা দিয়ে মানুষের দেহের ভিতরকার হাড় আমরা চোখের উপর দেখলুম। রসায়নবিদ্‌ তড়িৎকে কাজে লাগিয়ে খনিজ দ্রব্য থেকে সস্তায় বিশুদ্ধ ধাতু পাবার ব্যবস্থা করলেন।

হার্জ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন, পরবর্তী বিজ্ঞানী তাকে কাজে লাগাল। ঘরে বসে ছোট একটা যন্ত্রের কাঁটা ঘুরচ্ছি, মুহূর্ত মধ্যে আমেরিকা থেকে খবর, ইংলণ্ড থেকে অর্কেস্ট্রা, লক্ষ্ণৌ থেকে গান শুনতে লাগলুম।

সভ্য মানুষ আরও শক্তি পেতে চায়! তড়িৎ কি শেষ কথা! বিজ্ঞানী দেখল, তার চারদিকে যে নানা পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যে প্রচণ্ড শক্তির রূপ! কিন্তু শুধু কাগজে কলমে জানা নয়, শেষ অবধি একরকম



চিত্র—20

আমেরিকা থেকে খবর, ইংলণ্ড থেকে অর্কেস্ট্রা, লক্ষ্ণৌ থেকে গান শুনছে

পদার্থকে লোপ করিয়ে সে যে-শক্তি পেল, তার প্রচণ্ডতা মানুষকে স্তম্ভিত করল, বিভ্রান্ত করল।

তার পরের কথা কি? সকল রকম পদার্থকে কি মানুষ শক্তির রূপে নিয়ে যেতে পারবে? আর যদি পারে, তবে সে শক্তিকে কি রকম ভাবে ব্যবহার করবে?

ভাবী কাল এর উত্তর দেবে।

বিজ্ঞানী

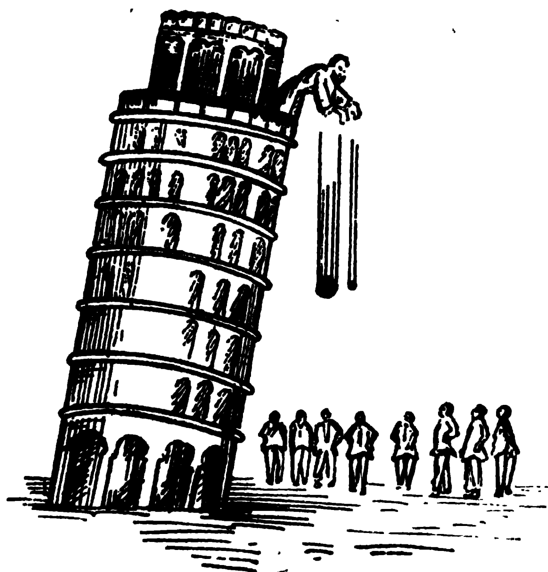
সূর্যোদয় থেকে একজন লোক একটা ছোট নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বসে কি দেখছে। পাশ দিয়ে

তিন জন কৃষক রমণী আঙুরের ক্ষেতে চাষ করতে যাচ্ছিল, তারা ওই লোকটিকে নমস্কার করে চলে গেল। সন্ধ্যার সময় তারা যখন ওই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিল, তখনও তারা দেখল লোকটি সেই রকমই বসে আছে, একই দিকে তার দৃষ্টি। লোকটিকে তারা শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল,—আহা বেচারা! সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ফেভার সমস্ত দিন ওই একই জায়গায় বসে একটি পোকার জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করছেন, আর দিনের পর দিন এই রকম করে চলেছেন।

ফ্যারাডে একটা পরীক্ষা দেখালেন—একটা তারের কুণ্ডলীর কাছে একটা চুম্বক আনলেন, কুণ্ডলীর মধ্যে ক্ষণিকের জন্য একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে অনেকে বলে উঠলেন,—দেখলুম তো বটে, কিন্তু এতে কি এসে গেল!

1591 সালে একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা ও শহরের অনেক লোক ওই শহরের বিখ্যাত হেলান দুর্গের তলায় এসে উপস্থিত হল। একজন অধ্যাপক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। লোকেরা নিচে থেকে দেখল, ওই অধ্যাপক দুটো বল নিলেন—একটা বড় অপরটা ছোট, বড়টা ছোটর একশ গুণ ভারি। লোকেরা দেখল, অধ্যাপক বল দুটো একসঙ্গে ছাড়লেন, আর এও তারা লক্ষ্য করল যে, বল দুটো একসঙ্গে মাটিতে পড়ল,

একসঙ্গে মাটিতে পড়ার শব্দও তারা শুনল। ওপর থেকে একটা ভারি জিনিষ আগে পড়ে, একটা হাল্কা জিনিষ পরে পড়ে, দু হাজার বছর ধরে লোকে এই কথাই শুনে এসেছে। এখন লোকে চোখের উপর অন্য রকম দেখল। কিন্তু



চিত্র—21

লোকেরা দেখল অধ্যাপক বল দুটো একসঙ্গে ছাড়লেন

দেখলে কি হবে, সেখানে বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা বলাবলি করল, এই কূটতার্কিক গ্যালিলিওকে দাবিয়ে রাখতে হবে। সে কি মনে করে যে একটা ভারি বল আর একটা হাল্কা বল একসঙ্গে পড়ল দেখেই শাস্ত্রের

উপর আমাদের আস্থা হারাব? শাস্ত্রে তো অন্য রকম লেখা আছে। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে অমান্য করে পুঁথির কথাতেই ফিরে গেলেন।

গ্যালিলিওর অনুসন্ধান নানা দিকে এগিয়ে চলল, তিনি শেষে এক দুরবীন তৈরি করলেন, তা দিয়ে তিনি আকাশের অনেক খবর বের করতে থাকলেন, এক নতুন গ্রহ আবিষ্কার করলেন। এই সময় তিনি তাঁর বন্ধু কেপলারকে এক চিঠিতে লিখছেন,—

'প্রিয় কেপলার,

আমরা দুজন কাছাকাছি থাকলে খুব একচোট হেসে নিতুম। পাডুয়ার দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে দুরবীন দিয়ে নতুন গ্রহ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালুম। তিনি এলেন না, পাছে চোখে দেখে স্বীকার করতে হয় যে আরও একটা গ্রহ আছে, আর সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও অন্য সব গ্রহ ঘুরছে।'

পুঁথির কথা ঠিক কিনা, এটা কি শেষ অবধি বিচার করতে হবে প্রকৃতির দ্বারে গিয়ে, কখনই না,—গ্যালিলিওর পরীক্ষা সম্বন্ধে মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা এই মন্তব্য করলেন। শিক্ষিত সাধারণ লোকের কাছে ফ্যারাডের আবিষ্কার একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হল। আর পোকামাকড় সম্বন্ধে ফেবারের কঠোর সাধনাকে চাষীরা অতি কৃপার চোখে দেখল।

কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ফেবার কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানের অনুসরণ করে চলেছেন, ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, অপেক্ষা করে আছেন প্রকৃতি রানী যদি কোনদিন তাঁর আবরণ একটুখানি উন্মোচন করেন, তিনি ধন্য হবেন। কি চিন্তা তাঁর, এতে পৃথিবীর কারও কোন উপকার হবে কি না। প্রকৃতির রাজ্যে একটা নতুন সংবাদ তো তিনি পেলেন, বস্, আর কিছু নয়, সেই তাঁর আনন্দ।

ফ্যারাডে নিজে যা দেখলেন, লোককে তিনি তা দেখালেন। প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে তিনি বললেন, হয়তো এমন দিন আসবে, যে দিন এর থেকে আপনি অনেক কর আদায় করতে পারবেন। সে দিন আসতে বেশি দেরি হল না। ফ্যারাডে যে পথ দেখালেন, সেই পথে চলে প্রচণ্ডশক্তি তড়িতের সৃষ্টি হল, তড়িৎ পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে দিল।

আর বিজ্ঞানরাজ্যের কালাপাহাড় হলেন গ্যালিলিও। সত্যকে নিজে পেয়ে তাঁর তৃপ্তি নেই, সেই সত্যের মন্ত্রে তিনি সবাইকে দীক্ষিত করবেন, এর জন্যে লড়াই করতে তিনি প্রস্তুত, আর একাই যদি লড়তে হয় তাতেও তিনি রাজি। এতে গোঁড়াদের হাতে তিনি নির্যাতন ভোগ করবেন, এ তিনি জানেন। কিন্তু তা হোক, সে নির্যাতন তিনি সহ্য করবেন! তিনি মনে করেন, সত্যের আলো থেকে যদি তাঁর বাতি জ্বলে থাকে, তবে সে

বাতি কোনদিন নিববে না, তা সে যত ঝড়-ঝাপটা খাক না কেন।

বিজ্ঞানকে যাঁরা প্রকৃত সেবা করেন, তাঁরা প্রকৃতির দ্বারে কৃপার পাত্র হয়ে ভিক্ষার আশায় দাঁড়িয়ে নেই। তাঁরা প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবেন, প্রকৃতির শক্তি কোথায়, কিসের উপর তা নির্ভর করছে, এই তাঁদের দৃষ্টি। তারপর প্রকৃতিকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে তাঁরা যুদ্ধে অগ্রসর হবেন। এ যুদ্ধ বহুকাল ধরে চলে, আর একমাত্র তাঁরা জয়ী হন যাঁদের শক্তি আছে, ধৈর্য আছে।

বিশিষ্ট রকম জীবাণুর টিকা দিয়ে সেই জীবাণুজনিত রোগের হাত এড়ান যেতে পারে, এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন পাস্তুর। পাঁচ বছর ধরে পাস্তুর তাঁর আবিষ্কারের কথা চিন্তা করে চলেছেন। রাত্রি এলে বিরক্ত হয়ে বলেন, এই ক ঘণ্টা বাধ্য হয়ে আমাকে চিন্তা থেকে অবসর নিতে হয়। বিজ্ঞানী লিভিকে তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তাঁর ক্লান্তি এসেছে কিনা। লিভি উত্তর দেন,—যতদিন পর্যন্ত প্রাণীর নাড়ীর মধ্যে একটাও অজানা জীবাণু রয়েছে, ততদিন আর ক্লান্তি কোথায়?

কাজের পুরস্কার বলতে আমরা যা বুঝি, প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাছে সে পুরস্কারের কথা আদৌ ঠাঁই পায় না। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিঅন যখন পাস্তুরকে বলেন যে তিনি তাঁর আবিষ্কার থেকে টাকা রোজকার করেন না কেন,

পাস্তুর উত্তর দেন,—আমি বিজ্ঞানের জন্য সব সময় পরিশ্রম করতে পারি, কিন্তু টাকার কথা মনে এলে আমার কাজে বিতৃষ্ণা জন্মে। পাস্তুর যদি তাঁর আবিষ্কার শুধু তাঁর নিজের কাছে রাখতেন, লোকের কাছে প্রকাশ না করতেন, তবে তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন বড় ধনী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, প্রকৃতির রাজ্য থেকে যা যোগাড় করলেন, সমগ্র মানবজাতিকে তিনি তা দিয়ে গেলেন, আর নিজের জীবন অতিবাহিত করলেন স্বল্প বেতনের রসায়নবিত্থার একজন অধ্যাপকরূপে।

গতিশীল চুম্বকের সাহায্যে তড়িৎউৎপাদন-প্রণালী আবিষ্কারের পর ফ্যারাডের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। তখন তাঁর সামনে তুটো পথ খোলা ছিল, টাকা রোজকার করা বা বিজ্ঞানের অনুশীলন করে যাওয়া। সে টাকার পরিমাণ বড় কম ছিল না, শেষ ত্রিশ বছর তিনি বছরে দশ হাজার পাউণ্ড করে উপার্জন করে যেতে পারতেন। কিন্তু ফ্যারাডে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বকে বাজারে বিক্রি করতে ঘৃণা বোধ করলেন। অথচ ফ্যারাডে ছিলেন গরিবের ঘরের ছেলে, একজন কামারের সন্তান, আর নিজের জীবন আরম্ভ করেন এক দপ্তরির কাছে শিক্ষানবিশ থেকে।

আগে খনির ভিতরকার গ্যাস প্রায়ই জ্বলে উঠত, ফলে যে সব অগ্নিকাণ্ড ঘটত, তাতে বহু লোক মারা যেত। গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ ব্যাপারটা নিবারণের জন্যে

একটা কমিটি বসল। কমিটির সভ্যেরা অনেক কিছু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতে কিছু হল না, শেষ অবধি তাঁরা তখনকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী হম্ফ্রি ডেভির শরণাপন্ন হলেন। ডেভি অনেক রকম চেষ্টা করলেন, শেষে এক রকম ল্যাম্প তৈরি করলেন, যা ব্যবহারে ওই রকম বিপদ ঘটবার আর কোন সম্ভাবনা রইল না। ডেভির এক বন্ধু, জন বডেল, ডেভিকে ওই ল্যাম্পের পেটেণ্ট নেবার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। পেটেণ্ট নিলে ডেভি বছরে পাঁচ থেকে দশ হাজার পাউণ্ড অনায়াসে রোজকার করতেন। কিন্তু ডেভি বললেন,—না, আমি একথা মোটেই চিন্তা করিনি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা। তা যে আমি একটুও পেরেছি, সেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ, আর এ আনন্দ আমি চিরদিন ভোগ করে যাব।

আজকের দিনের একটা ঘটনা হল এই। সম্প্রতি স্ট্রেপ্টোমাইসিন বলে একটা ওষুধ বেরিয়েছে, অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি এ ওষুধে সারছে। ওআকস্‌ম্যান এই ওষুধ আবিষ্কার করেন, আর এর থেকে তিনি প্রায় 40 লক্ষ টাকা পেয়েছেন। সমস্ত টাকাটা তিনি দিয়ে দিলেন এই জাতীয় অন্য ওষুধ আবিষ্কার করার কাজে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, জয় ও পুরস্কার যদি পিছনে না থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিজ্ঞানী প্রেরণা পাবে কেন? উত্তরটা সোজা। জ্ঞানের তৃষা, নব নব আবিষ্কারের

আনন্দ, আর মনুষ্যজাতির প্রতি কর্তব্য চিরদিন মানুষকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

1865 সালে প্যারিস শহরে যখন কলেরার প্রাতুর্ভাব হয়, তখন পাস্তুর হাসপাতালে কলেরা ওআর্ডের পাশের ঘরে বসে ও-সম্বন্ধে দিনরাত অনুসন্ধান করে চলেছেন। পাস্তুরের এক বন্ধু লিখে পাঠালেন,—এতে বিপদ আছে। একটি ছোট চিরকুটে পাস্তুর উত্তর দিলেন, - কিন্তু কর্তব্য!

আর একটা ঘটনার কথা স্মরণ করলে আমাদের স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

নতুন পৃথিবীতে একটা রোগ ছিল পীতজ্বর, মারাত্মক রোগ, বহু লোক এতে মারা যেত। পীতজ্বর কি করে হয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে একটা কমিটি নিযুক্ত হল। কয়েকটি ঘটনা দেখে কমিটির সভ্যেরা অনুমান করলেন যে, এক রকমের মশা এই রোগ ছড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় কিনা পরীক্ষা করতে হবে। প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হলেন ল্যাজিআর বলে কমিটির একজন সভ্য ও ক্যারল নামে এক ভদ্রলোক। তুজনেরই বাড়িতে স্ত্রীপুত্র আছে, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করলেন। পরীক্ষায় ল্যাজিআর প্রাণ দিলেন। কিন্তু আরও পরীক্ষা চাই।

কিসেন্‌জার নামে একজন সৈন্য, আর সেনা-বিভাগের একজন কেরানি—নাম মোরান, কমিটির সভাপতি রীডের

কাছে এসে বললে,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক। রীড তাদের বিপদের কথা বললেন, জানালেন যে প্রাণহানিও ঘটতে পারে। তারা বললে,—আমরা জানি, আর জেনেই এসেছি। তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে,—রীড বললেন। লোক দুজন ফিরে চলল, বলল,—পুরস্কারের লোভে আমরা আসিনি। রীড তাদের ডাকলেন, আর নত হয়ে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করি। শেষ অবধি পীতজ্বরের কারণ বেরল, আর পৃথিবী থেকে পীতজ্বর তাড়ান সম্ভব হল। কিন্তু এই অনুসন্ধানে ল্যাজিআর প্রাণ দিলেন, কয়েকজন প্রাণ দিতে গেলেন। লোকে এঁদের কথা ভুলল, কিন্তু এঁরা পৃথিবীর অসংখ্য লোকের জীবন রক্ষা করে গেলেন।

অ্যাটম-বোমা মুহূর্ত মধ্যে দুটি বড় শহরকে ধ্বংস করল। কেউ কেউ বললে, বিজ্ঞান এর জন্যে দায়ী। যা হোক, আজ সমগ্র সভ্য দেশের রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের নিয়ে চেষ্টা করছে কি করে অ্যাটমের শক্তিকে শিল্পে, কৃষিতে, যানবাহনে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণসাধন করা যায়। কিন্তু এ দুটোর কোন কথাই বিজ্ঞানীর কাছে তত মূল্যবান নয়। সে এই জ্ঞান লাভ করে আনন্দে বিভোর যে পদার্থ শক্তির এক রূপ! কি এ বিস্ময়! আর বিশেষ রকম পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার উপায় সে আবিষ্কার করল। কি অসামান্য তার সাফল্য!

পরিশিষ্ট

যুগ-যুগান্তর পরে মানুষ

জীবের একটা ধর্ম হল, তার মৃত্যু। প্রাণিজাতি যুগে যুগে পূর্ণ হতে পূর্ণতর জীবন লাভ করে চলেছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু ছিল বলে জীব কালে কালে এক অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থায় চলে আসছে। এই নিয়মের বশে অপরিণত অপরিস্ফুট আদিম জীব আজ মানবত্বে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু একটা কথা। কালস্রোত তো নিরবধি চলছে, আর বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সকলের পরিবর্তনের কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। মানবত্ব কি জীবের শেষ পরিণতি ? যদি না হয়, তবে কোন্ উন্নততর রূপ সে নেবে, আর কত যুগ পরে ?

একজন মানুষের জীবদ্দশায় হাজার রকমের ভিন্ন ভিন্ন নতুন উদ্ভিদ্ দেখা দিচ্ছে। জীবাণুতেও এই রকম দেখা যায়। এই সেদিন অবধি জানা ছিল যে, নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু এক রকমের, কয়েক বছরের মধ্যে তারা নাকি 32 রকমে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানবদেহের পরিবর্তন এত ধীরে হয় যে, একজন মানুষের জীবদ্দশায় সে পরিবর্তন ধরা পড়ে না। সুতরাং মানবদেহের যে

পরিবর্তনের কথাটা আমরা বলতে যাচ্ছি, তা হবে সুদূর ভবিষ্যতে, আর সন তারিখ দিয়ে সে সময়ের কথা বলা যাবে না। তবে পরিবর্তন হবেই। ব্যাঙের পা, কচ্ছপের পা, পাখির ডানা, ঘোড়ার সামনের পা, তিমির পাখনা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত কালে-কালে ধাপে-ধাপে দেখা দিয়েছে। মানুষে এসে পরিবর্তনের ধারা থেমে যাবে কেন? বর্তমান মানুষের বেশি আগের পূর্বপুরুষের গায়ে আঁশ ছিল, এখন নেই। ওদের পরে যারা এল, তাদের শরীরে একটা লম্বমান পদার্থ ছিল, এখন তা ঘুচে গিয়েছে। তারা চার-পায়ে চলত, এখন দুপায়ে চলে। তবে কেন ধরে নেব যে ভাবীকালের মানুষের ঠিক এখনকার মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকবে। তার দেহের এক একটি অঙ্গের কি রকম পরিবর্তন হবে দেখা যাক। তবে কল্পনাকে বেশ কিছু ছুটিয়ে দিতে হবে।

এখনই দেখা যায়, কালীতলা থেকে গোলদিঘি পর্যন্ত যেতে হলে জোয়ান জোয়ান যুবক ট্রাম বা বাস্-এ চড়ছে। চলার কাজ ধীরে ধীরে কমে আসছে। ফলে বর্তমান যুবকের প্রপৌত্র বা তস্য প্রপৌত্রদের পা সরু লিক্‌লিকে মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো হয়ে আসবে, আর তাদের বহু অধস্তন সন্ততিদের ওই অবয়ব একেবারে লোপ পাওয়া বিচিত্র নয়।

দেহ শুকাবে, কিন্তু মাথার কাজ বেড়ে চলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার আয়তন বাড়তে থাকবে। হাতকে আর পরিশ্রম করতে হবে না, এক একটা ইলেক্‌ট্রিক বোতাম টিপলেই হাতের গোড়ায় সবই পাওয়া যাবে। হাত কাজ না করায় হাতের পেশী আর থাকবে না। অতীতের মানব (তাকে মানবই বললুম) যখন লাফ দিয়ে এ-ডাল ও-ডাল করত, তখন তার বুড়ো আঙ্‌লকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হত, আর সেই আঙ্‌লে বড় রকম পেশী ছিল। ব্যবহারের অভাবে সে পেশী আজ লোপ পেয়ে গিয়েছে। সুতরাং ব্যবহারের অভাবে ভাবীকালের মানুষের হাতের দশা তার পা-এর মতোই হবে।

দাঁতের পরিবর্তনের লক্ষণ আমরা তো আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখছি। আমাদের প্রপিতামহ পিতামহরা যে-সকল জিনিস খেতেন তার চেয়ে অনেক নরম জিনিস আমরা খাই। আমাদের মাড়িকে এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়, কড়্‌মড় করে আর হাড় চিবুতে পারি না। দন্তচিকিৎসকেরা বলছেন, কয়েক পুরুষের মধ্যে প্রত্যেক পাটি থেকে দুটো করে দাঁত লোপ পেয়ে যাবে। আজও দেখা যায়, কারও কারও আঁক্কেল হলেও আক্কেল দাঁত উঠে না। কিন্তু আরও বহুপুরুষ পরের কথা ধরা যাক। তখন মানুষের দাঁত আর একদম থাকবে না। কারও কারও যদি বা একটা-দুটা উঠে পড়ে

তবে সে লজ্জায় বাড়ির বের হবে না, আর চুপি চুপি সেটা তুলে ফেলবে।

আজ আমরা আমাদের দেহে 68টি উপাঙ্গ বা উপাঙ্গের অংশ বয়ে বেড়াই, অথচ তাদের বিশেষ কোন কাজ নেই। কালক্রমে এগুলি লোপ পাবে।

এইবার কান। অণুবীক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, শহরের কোলাহলের মধ্যে যাদের দিন কাটছে, তাদের কানের সেলগুলি আংশিকভাবে জখম হয়েছে। এখনই আমরা দেখি পাড়াগাঁয়ের লোক শহরে এলে শহরের গোলমালে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, কিন্তু শহরের লোকের তা সয়ে গিয়েছে। কালস্রোতে শহরের গোলমাল বেড়ে যাবে, শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। মানুষের শব্দের অনুভূতিশক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানের আকার বদলে যাবে, আয়তনে ছোট হয়ে আসবে, নতুন রকমের রূপ নেবে।

চোখের প্রধান অংশ হল একখানা লেন্স। নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই লেন্সের বক্রতা বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা কাছের জিনিস দূরের জিনিস দেখি। চোখ যখন তা পারে না, তখন চোখের সমুখে একখানা কাচের লেন্স ধরা হয়। কিন্তু এই লেন্স ধরে রাখতে আমাদের কতই না নাস্তানাবুদ হতে হয়। দু কান থেকে দুটো ডাঁটি বেরিয়ে এল, ওদের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে আর একটা ডাঁটি জোড়া

রইল, সেই ডাঁটি লেন্স দুটো ধরে রইল। ভবিষ্যতে এসব হাংগামা চলে যাবে। ছোট্ট একটু অস্ত্রোপচারে চোখের লেন্সের গায়ে পাতলা একখানা কাচের লেন্স জুড়ে দেওয়া হবে। বস্, আর কিছু করতে হবে না। সুদূর নয়, নিকট ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের এ কৃতিত্ব দেখা যাবে, চোখের দোষের জন্য কানের দুর্গতি হবে না।

চুল কমবে, টাক বাড়বে।

কল্পনায় ভাবীকালের একজন মানুষকে দেখছি। মাকড়সার মতো হাত-পা, মাথা হেঁড়ে, টেকো, দাঁত নেই, কান না থাকারই মধ্যে, বসে আছে, সম্মুখে কতকগুলি ইলেক্ট্রিক বোতাম, মাঝে মাঝে এটা ওটা টিপছে।

হয়তো আবার এরকম নাও হতে পারে।

যুগ-যুগান্তর পরে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী

পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের ভবিষ্যৎ কি হবে?

পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কিন্তু ভিতরটা এখনও প্রচণ্ড গরম। ভিতরের শক্তি এখনও পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দিচ্ছে। সুতরাং এখনও পৃথিবীর দেহে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। 4 কোটি বছর আগে হিমালয়, আণ্ডিস মাথা তুলে উঠে, 2 কোটি বছর আগে আল্পসের জন্ম হয়, ভবিষ্যতের মানুষ পৃথিবীর গায়ে ওই

রকম বিপ্লব দেখতে পাবে। এই ভবিষ্যৎটা নিকট বা খুব দূরে জোর করে এখন বলা যাচ্ছে না, এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে ভূতত্ত্ববিদ্‌কে পৃথিবীর ভিতরকার অনেক খবর যোগাড় করতে হবে, যা এখন তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে সুস্থ থেকে আর আনন্দের সঙ্গে এ পরিবর্তন দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। পৃথিবীর যে যায়গায় নতুন পর্বত দেখা দেবে, আগে তার চারদিকে বহুস্থানে জোর ভূমিকম্প হবে, আগ্নেয়োচ্ছ্বাস দেখা দেবে, জায়গাটা প্রাণিশূন্য হবে। কিছু দূরেও ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস মানুষকে একেবারে নিরাপদ রাখবে না। তবে একটা আশার কথা এই, আমাদের জীবদ্দশায় এসব ঘটবে না। আমাদের পর আস্থক আগ্নেয়োচ্ছ্বাস, আস্থক জলোচ্ছ্বাস, হোক ভূমিকম্প, যাক পৃথিবী রসাতলে !

এসব বিপ্লব ভবিষ্যতে কবে দেখা দেবে বলতে না পারলেও ভাবীকালে পৃথিবীর আবহাওয়ার কি রকম পরিবর্তন হবে, তার একটা আভাস দেওয়া যায়। মেরু থেকে হিমশৈল এক একবার এগিয়ে আসে, আবার পিছু হঠে, অবশ্য বহুযুগ পরে পরে। কেউ কেউ হিসেব করে বলছেন, আজ থেকে 50 হাজার বছর পরে একবার, আর 70 হাজার বছর পরে আর একবার উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তর-ভাগ বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তখন ইউরোপের অস্‌লো, কোপেনহেগেন, স্টক্‌হলম শহর নিশ্চিহ্ন হবে,

আর হিমশৈল লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিনের কাছাকাছি এসে থামবে! কেন যে ওখানকার লোক যুদ্ধ করে মরছে!

কিন্তু এর মধ্যে, নাগাদ কুড়ি হাজার বছর পরে, পৃথিবীর উত্তাপ খুব বেড়ে যাবে। আবার 50 হাজার বছর পরে ওই হিমশৈল আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী খুব বেশি রকম ঠাণ্ডা হবে।

তার পরের কথা। পৃথিবীর ভিতরটা ক্রমশ শান্ত হবে, পর্বত আর ঠেলে উঠবে না। কিন্তু বৃষ্টির কাজ চলতে থাকবে, পৃথিবীর সমস্ত পর্বত ক্ষয়ে ক্ষয়ে লোপ পাবে। তখন পৃথিবী এক বিরাট সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ঠাণ্ডা-গরমের বিশেষ তফাৎ থাকবে না। দার্জিলিং, শিমলা, মুসৌরি পাহাড় থাকবে না, আর সে-সব জায়গায় যাবার দরকারও হবে না। সমুদ্র আরও ঠেলে আসবে, সুতরাং কলকাতাকে সমুদ্রগর্ভে যেতেই হবে।

ভবিষ্যতে চন্দ্র সূর্যের দশা কি হবে?

200 কোটি বছর আগে পৃথিবীর একটা অংশ ছিট্‌কে বেরয়। সেটা হল চন্দ্র। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব বেড়ে চলল, এখন 2 লক্ষ 39 হাজার মাইল দাঁড়িয়েছে। আরও বাড়বে। চন্দ্র যখন পৃথিবীর অঙ্গীভূত ছিল, তখন চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর পৃথিবীর দিন হত, চন্দ্র চলে যাবার

ফলে এখন ওটা 24 ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে সৌর দিন ও চান্দ্র মাস এক হবে, আর বর্তমানের 47 দিনে দাঁড়াবে।

চন্দ্র পৃথিবী থেকে হঠে যেতে যেতে শেষ অবধি একটা সীমায় এসে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরবে। তার পর একদিন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর সম্ভবত শনির বলয়ের মতো পৃথিবীর বলয়রূপে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে।

সূর্যের হাইড্রোজেন হিলিয়মে পরিবর্তিত হওয়াতেই সূর্যের তেজ। বর্তমান কালে সূর্যের হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা 35 ভাগ। কিন্তু এ হিসেব থেকে যত যুগ দাঁড়ায়, তার চেয়ে কম সূর্যের আয়ু। কারণ যত দিন যাবে সূর্য তত বেশি উজ্জ্বল হবে, জোর আগুনের জন্যে ইন্ধন খরচ বেড়ে চলবে, বেশি হারে হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হবে। সূর্যের তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও তাপ বাড়বে, এত বাড়বে যে, পৃথিবীর সমস্ত জল ফুটে শেষ হবে, পৃথিবীর অনেক জীব মরে যাবে। সূর্যের তেজ আরও বাড়বে, তারপর খুব তাড়াতাড়ি তার তাপ কমতে কমতে গিয়ে একেবারে নিবে যাবে। হাজার কোটি বছর পরে এই রকম হবে, হবেই হবে, মিলিয়ে দেখো! সূর্য শেষ হবার সময় গ্রহগুলোকে ধ্বংস করবে, সৌরজগতের এখানেই অবসান। তার পর?

তারপর,—

“খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
মুহূর্তেই যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার
সৃজনের ধ্বংস যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্র-মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিল মহাধ্যান॥” (রবীন্দ্রনাথ)

